সীমানা

অরুণ চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা—১২

এপ্রিল ১৯৫৮ ॥

প্রকাশক
স্থরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২ ॥

ছেপেছেন
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
উৎপল প্রেস
১১০।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা ৯ ॥

প্রচ্ছদপট
শঙ্কর দাশগুপ্ত

দাম ১'৭৫ ন. প.

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে গুলি চালনার ফলে নিহত দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের অন্যতম, দামুকদিয়ার ছেলে সেই তরুণ সাহিত্য-পিপাসু এঞ্জিন ক্লীনার দিলবার হোসেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার এ ক্ষুদ্র বইখানা সমর্পণ করলাম।

অরুণ চৌধুরী

এই গল্পগুলো লেখা হয়েছে ইংরাজি গত ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

এর মধ্যে 'যাদু' নামক গল্পটি এক সময় 'পরিচয়' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

উপস্থিত সংকলনে সন্নিবেশ করবার সময় এই গল্পটিকে এখানে ওখানে সামান্য এক আধটুকু পরিমার্জিত করে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

—লেখক

কাফেলা

মুই তো আর পারি না বাহে!...ধপ্ করে হাতের ছোট পুঁটুলিটা পথের উপরে ফেলে, দুই হাতে নিজের মাজাখানা চেপে ধরে অবশেষে সালেমা মাটিতে বসে পড়ল। সে আর কিছুতেই হাঁটতে পারবে না।

—তা হইলে!...ইসমাইলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল—কাটালটা যদি পার হওয়া গেল হায়, তা ও তো হইল হায়!..বলল বটে, কিন্তু প্রহারজর্জরিত শরীরখানা নিয়ে সেও মাটিতে বসে পড়ল।

কাটাল অর্থাৎ কিনা শালবন। পাহাড়িয়া শাল নয়। দেড় হাত দু-হাত পরিধি, বিশ পঁচিশ হাত উঁচু, এই রকম সব ছোট ছোট শাল গাছ।

পূর্ণিয়ার কাছে গঙ্গা পার হয়ে, বিহারের সীমানা ছাড়িয়ে, কিছুটা আঁকা-বাঁকা পথে, মোটামুটি সোজা পূবদিক ধরে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের মোহানা পর্যন্ত যদি যাওয়া যায়, তবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও এই রকম সব শালবন এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। এই শালবনগুলি চওড়ায় সব সময়ে খুব বড় না হলেও, লম্বায় কখনও কখনও দেড় দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। জঙ্গলে, শাল ছাড়া অন্যান্য গাছ-গাছড়াও এখানে সেখানে দেখা যায়।

এই রকম একটা শালবনের প্রায় মাঝামাঝি এসে তরুণ-তরুণী তুটি ক্লান্ত হয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিল। অর্ধেক রাত থাকতে তারা হাঁটা শুরু করেছিল। লোকালয় এড়িয়ে, ঝোপ-ঝাড় দিয়ে, খেত-খামারের আল ঘুরে ঘুরে মানুষের দৃষ্টি আর জিজ্ঞাসাবাদের ঝামেলাকে ফাঁকি দিয়ে সারাটা দিন ধরে তারা হেঁটেছে আর হেঁটেছে। ভেবেছিল, কোনও মতে সন্ধ্যা হতে না হতে যদি এই শালবনটা পার হয়ে যেতে পারে, তবে শালবনের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে যে সব সাঁওতাল ওঁড়াও গ্রাম আছে, তারই কোনও একটাতে রাতের মতো তারা একটুখানি আশ্রয় খুঁজে নেবে। পরদিন ভোর বেলা ফের হাঁটা দিয়ে তুপুরের ট্রেন ধরবে নিকটবর্তী রেল স্টেশনে। কিন্তু আর পারল না। অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলোটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত গাছের আগায় চিক্‌চিক্ করছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন একটু আশা ছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে সমস্ত জঙ্গলটার উপরে আঁধার নেমে এল চারিদিক কালো করে। সঙ্গে সঙ্গে শীতও নামল। আর চেষ্টা এখন বৃথা! খস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে, একটা বিড়ি নিজে ধরিয়ে আর একটা বিড়ি এই আধা-পরিচিত আধা-অপরিচিত তরুণীটির দিকে এগিয়ে দিয়ে ইসমাইল বললে—খাইবে বাহে?

—মুই বিড়ি না খাই বাহে!....সালেমা মাথা নেড়ে জানাল।

—এ্যালায় কি করা হইবে?....ইসমাইল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সমস্যাটা আলোচনার জন্য তুলল। দীর্ঘদিন তেল না

দেওয়া রুক্ষ চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সালেমা ইসমাইলের মুখের দিকে তাকাল। সেও এই কথাটাই ভাবছিল। কিছুক্ষণ বুদ্ধি পরামর্শ করতে করতে বোঝা গেল যে অবস্থা অনেক সময় আপাতচক্ষে যতটা আয়ত্তের বাইরে বলে মনে হয়, আসলে অনেক সময়েই ঠিক ততটা আয়ত্তের বাইরে নয়। দু-তিনটে মাথা এক জায়গায় করে কায়দা-মতো ঘামাঘামি করলে প্রায়ই একটা না একটা কিছু উপায় খুঁজে বের করা খুব মুশ্‌কিল হয় না। আর, একখানা মাথাতে যদি খানিকটা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি থাকে তবে তো কথাই নেই। আহার সংগ্রহের কথা উঠতেই, সালেমা যখন তার হাতের ছোট পুঁটুলিটা খুলল তখন দেখা গেল যে তার ছেঁড়া শাড়িখানার ভাঁজে ভাঁজে বড়-বড় ডজনখানেক মিঠে আলু। সুতরাং আহারের সমস্যাটা একরকম করে মিটল। এই রকম একটা মৌলিক ধরনের সমস্যার এমন নগদ সমাধানে পরম একটা তৃপ্তি বোধের মাঝে অস্পষ্টভাবে চিরন্তন সত্যের সেই উষ্ণ মধুর এক অনুভূতি এনে দিল ইসমাইলের মনে যে নারী মানুষ তো বটেই, উপরন্তু সে নারীও। পথ চলতে চলতে কয়েকবার সালেমা পেছনে পড়েছিল বটে কিন্তু সেই ফাঁকে ফাঁকে কখন যে সে পথের পাশের খেত থেকে কোন সময়ে এই খাদ্য সংগ্রহ করেছে, ইসমাইল তা বুঝতেও পারেনি। বেশ একটু বিস্ময়ও সে বোধ করল সালেমার এই মানসিক স্থৈর্যে। সালেমা পরামর্শ দিলে, আগুন জ্বালাতে পারলে, মিঠে আলুগুলো পুড়িয়ে নেওয়া যেত এবং তা হলে তা খেতে আরও ভাল লাগত। বটে, বটে!

ইসমাইলের বুদ্ধিটা আর খানিকটা খুলে গেল। আগুন তো করতেই হবে। আগুন না পেলে এই শীতে রাত কাটানো যাবে না। তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে আগুন না জ্বালিয়ে থাকাটাও নিরাপদ নয়। জীন পরীর ভয় ইসমাইল করে না। বাল্যকালে অনেকবার সে দলবল সহ এই শালবনের মধ্যে রাতে আঁধারেও ঢুকেছে মৌচাক কাটবার জন্য। তাছাড়া দিনের আলোতেও এইসব বনের আনাচে কানাচে বহু ঘুরেছে সে হরিতকী, বয়ড়া, আমলকি গাছের তলে তলে, শতমূল অনন্তমূল প্রভৃতি গাছ গাছড়ার খোঁজে, তার দোস্ত রহিম কবিরাজের ছেলে ইদ্রিস আলির সাথে। সুতরাং বন জঙ্গল সম্পর্কে কোনও অহেতুক ভীতি ইসমাইলের মনে নেই। তার ভয় হচ্ছে শুধু জানোয়ারের জন্য। নানার মুখে এ সমস্ত বন-জঙ্গলের জানোয়ারদের বহু কাহিনী শুনেছে সে তার শৈশবে। বুনো মোষ, বুনো শুয়োর, হরিণ, ময়ূর, খরগোশ আর বাঘের কত না রূপকথার মতো চমকপ্রদ গল্প! আজকাল অবশ্য খরগোশ, বুনো শুয়োর ছাড়া অন্য কোনও স্থায়ী বাসিন্দা এখানে নেই। তবে বাঘ প্রায়ই আসে। বিশেষ করে এই শীতকালটায়। অতএব আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতেই হবে।

এরই মধ্যে অন্ধকার এতটা জমে এসেছে যে, মনে হচ্ছে সমস্ত জঙ্গলটা জুড়ে কে যেন অবিরল ধারায় ঘন আলকাতরার মত একটা কাল তরল পদার্থ নিঃশব্দে ঢেলে দিচ্ছে। আর সেই কাল তরল পদার্থের ধারাটা মাটিতে পড়বার সাথে সাথেই যেন জঙ্গলের বুক থেকে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে অজস্র আগুনের ফুল্‌কি।

বাস্তবিকই, জোনাকিগুলো যেন হাজার হাজার আগুনের ফুলকির মতই ঝিকিমিকি করে আকাশে ঠেলে উঠতে চাইছে। কেউ কেউ গাছের আগা পর্যন্ত গিয়ে ডাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঠেকে থাকছে। কেউ কেউ ফের ধাক্কা খেয়ে দ্রুতগতিতে মাটিতে ফিরে আসছে। চোখ খুলে এই দৃশ্যটা বেশিক্ষণ চেয়ে দেখতেও যেন ইসমাইলের ভয় লাগছিল, পাছে সে সম্মোহিত হয়ে যায়। সুতরাং আর দেরি না করে, সালেমাকে সঙ্গে নিয়ে শুকনো পাতা আর ভাঙা ডালপালা কুড়োতে কুড়োতে ডেরা পাতবার জন্যে খুঁজে খুঁজে সে একটা পরিষ্কার জায়গা বের করল। ঘোরাঘুরি করতে করতে প্রায় উপরি পাওনার মত দু-তিন আঁটি খড়ও পাওয়া গেল। সম্ভবত কোনও অসাবধানী গাড়িয়ালের হাট ফিরতি গরুর গাড়ি থেকে ওগুলি পড়ে গেছে। মাঝখানে আগুন করবার জন্য শুকনো ডালপালা পাতাগুলি স্তূপীকৃত করে, খড়ের আটিগুলি বিছিয়ে দুইপাশে দুটো শয্যা রচনা করে নিতে সালেমার বেশি দেরি হল না। কিন্তু দেশালাই জ্বালিয়ে অগ্নি সংযোগ করতে গিয়ে হঠাৎ সরকারি বনবিভাগের পাহারাদারদের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ইসমাইল থেমে গেল। দেশ বিভাগের পূর্বে এ সমস্ত বনগুলির মালিকানা ছিল রাজা জমিদারের, চুরি চামারি থেকে গাছগুলি রক্ষা করবার জন্য এগুলি তত্ত্বাবধানের দায়ও ছিল তাদেরই। পরবর্তীকালে এগুলির মালিকানা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ধারণা প্রচলিত থাকলেও, একটা বিষয় সকলের কাছেই খুব সুবোধ্য হয়ে উঠেছিল যে এগুলি তত্ত্বাবধান করবার ভার বনবিভাগের ওপর।

দেশের বন সম্পদের সমৃদ্ধি বা তার অপচয় রোধের ব্যাপারে বিভাগীয় কর্মচারীদের চিন্তা ও আগ্রহের গভীরতা পরিমাপ করা খুব কষ্টকর হলেও, নিয়ম কানুনের কড়াকড়ির উৎকট তীব্রতার আস্বাদ লাভে বঞ্চিত হয়েছে খুব কম লোকই। ছুতায় নাতায় ধর-পাকড়ের তো আর অন্ত নেই! কে জানে, কাছে কিনারে যদি কোথাও কোনও পাহারাদার থাকে? নজরে পড়লে তো ফের খামোখা আর এক হয়রানি!—কাটাল পুলিশ যদি ফের তাড়া করিয়া আইসে?…একটু চিন্তিত হয়ে সালেমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে ইসমাইল কথাটা আস্তে আস্তে বলে।

—তোঁরাও ভাল হইছেন!…ঠাট্টা মেশানো স্মিত একটা হাসিতে দুশ্চিন্তাটা একেবারে হাল্‌কা করে দিয়ে সালেমা উত্তর দিল—খাওয়া না খাওয়া দর্মা! এই শীতের মধ্যে ফের কাটাল পুলিশ কেমন পাহারায় আইসে? যাইয়া দেখো, ওম্‌রা এতক্ষণ কোনও তালেবরের ঘরে খাওয়া দাওয়া সারিয়া নিঁদ্‌ আসিবার ব্যবস্থা করোছে।……যে আট দশদিন সালেমা বেলডাঙার কাজীদের বাড়ি আটক হয়েছিল, সেই কয়দিনেই সালেমার চোখের সম্মুখে গ্রামদেশের উপরতলার জগৎটা বেশ যেন খুঁটি-নাটি ভাবেই খোলসা হয়ে গেছে। মফস্বলে সফরে ব্যস্ত ছোট বড় মাঝারি হাকিম আর তাদের চেলা চামুণ্ডারা আর এদিকে গ্রামের চৌকিদার দফাদার, দেওয়ানী পঞ্চায়েতদের মিলন ক্ষেত্র এই তালেবর অর্থাৎ জোতদারদের বাড়িগুলো যে কেমন জায়গা তা বুঝবার জন্য আর কোনও অভিজ্ঞতার অপেক্ষা তাকে করতে হবে না।

আগুনটা বেশ গন্‌গনিয়ে উঠে চারিদিকে একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইসমাইল তার নির্দিষ্ট খড়ের শয্যায় ভাল করে চেপে বসল। মাথায় মুখে তার ধুলোবালি কিচকিচ করছিল। কিন্তু গামছাখানা তার ধস্তাধস্তির সময়ে কাজীদের বাড়িতেই কখন যেন পড়ে গিয়েছিল। সেখানা আর উদ্ধার করা যায়নি। অগত্যা, গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটাই খুলে নিয়ে তাই দিয়ে গা-টা ঝেড়ে, ফের সেটা গায়ে এঁটে নিল। হাত, পা আগুনে সেঁকে একটা আরাম আনবার চেষ্টা ইসমাইল করছিল, কিন্তু সারাদিন হাঁটাহাঁটির মধ্যে প্রহারের যে বেদনা সে টের পাচ্ছিল না, এখন যেন সেই বেদনাটা সারা শরীরে টন্‌টন্‌ করে উঠল। আগুনে সেঁকা উষ্ণ হাতের তালু দিয়ে সে দেহের কালশিরা-পড়া ফুলে-ওঠা জায়গাগুলো হাত বুলোতে লাগল আস্তে আস্তে। আগুনের অন্য দিকটায় বসে, পুঁটুলি খুলে মিঠা আলুগুলো বের করে পোড়ানোর ব্যবস্থা করছিল সালেমা। বললে,—খুবই ডাঙাইছে চাবুক দিয়া! না বাহে?......একটা গভীর সহানুভূতির কোমলতায় মাখানো সালেমার কণ্ঠস্বরটা শেষের দিকটায় একটু কেঁপে উঠল। আগুনের আলোয় ইসমাইলের মনে হল সালেমার চোখের কোণাটাও যেন ভিজে উঠে একটু চক্‌চক করে উঠল। কিন্তু গত রাত্রে কাজীদের বাড়িতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার নিজে অসহায়তার কথা মনে হতেই একটা চাপা ক্রোধে সে গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা ছোট অস্ফুট শব্দ বের হল—হুঁ।

নিজের শৈথিল্যের জন্য ইসমাইল নিজেও একটু অনুতপ্ত

বোধ করছিল। বিলের মাছ যে এযাবৎকাল আশপাশের গ্রামবাসীরা মেরে খেয়ে আসছে, সে তো খুব সত্য কথা। তা ছাড়া স্মরণাতীত কাল থেকে বিলটা যে খাস অবস্থায় আছে তাও সকলেরই জানা। সুতরাং ইসমাইলের মতো সকলেই এ কথা বুঝেছিল যে প্রতিবারের মত এবারেও যদি গ্রামবাসী বিলের মাছ মেরে খায় তবে তা আইনত কখনই দোষণীয় হতে পারে না। কিন্তু মানুষ গোলমালে পড়ে গেল কাজীদের প্রচারে। কাজীরা প্রচার করল যে এবার তারা ঐ বিল ডেকে নিয়েছে, সুতরাং অপর কেউ যেন সেখানে নামার সাহস এবার না করে। এতকাল ধরে নির্ব্বিরাদে ব্যবহার করে আসা বিল আজ হঠাৎ কেন ডাক হল, কোথায় ডাক হল, কিভাবে ডাক হল,—এ সব প্রশ্নে মানুষের মনে কাজীদের প্রচার সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও, ইসমাইলের জোট বাঁধার চেষ্টা ব্যর্থ হল। মানুষ যেটুকু ঘাবড়ে ছিল, তাতেই পিছু-পা হল। আর এতেই কাজীদের সাহস গেল বেড়ে। ইসমাইল সময়মত ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। কাজীরা যে তাকে ধরবার চেষ্টা করছে, এমন কি বাগে পেলে খুনও করে ফেলতে পারে এ খবরটা তার দোস্ত ইদ্রিস আলি তাকে একবার না জানিয়েছিল তা নয়। তার চাচা মিঞাও দিনকয়েক আগে তাকে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কিন্তু তার দোষ, ওসব কথা আমলে আনেনি। একটু সতর্ক হলে বিপর্যয়টা যে এড়ানো না যেত তা নয়।

সে যাক। যা হয়ে গিয়েছে, তা তো হয়েই গিয়েছে। উপস্থিত ইসমাইলের দুর্ভাবনার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার

সঙ্গিনী এই নারীটি। একে সঙ্গে নেওয়া বা না নেওয়া ইসমাইলের কোনও ইচ্ছা সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল না। কাজীদের বাড়িতে হাত পা বাঁধা প্রায় বেঁহুশ হয়ে যখন সে একটা বদ্ধ কুঠুরিতে পড়েছিল এমন সময়ে গভীর রাতে এই নারীটি কেমন করে যেন সেই ঘরে ঢুকে তার বাঁধন খুলে দিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু তা একটি মাত্র শর্তে যে তাকে সঙ্গে নিতে হবে। আঁধার রাতে নিস্তব্ধ কাজীবাড়ির কোণা কান্‌ছি ঘুরে ঘুরে, এই নারীর পেছনে পেছনে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বের হয়ে এসেছে। কিন্তু ভাবনা চিন্তা করবার অবকাশ তখন কোথায়? তবে সারাটা দিন পথ চলতে চলতে প্রথম পদক্ষেপটা সে ভেবে ঠিক করে ফেলেছে। স্থির করেছে যে একে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সে তার এক দোস্ত গ্যাঙম্যান ওসমানের ওখানে উঠবে। ওসমান যে কোয়ার্টারে থাকে সেখানে অন্য আর কোনও গ্যাঙম্যান থাকে না। আর যে থাকে সে হচ্ছে ওসমানের মা। বুড়ির বেটি লোক খুব ভাল। তাকে খুবই স্নেহ করে। বহুবার বিপদে আপদে সেখানে গিয়ে সে থেকেছে। সুতরাং অসুবিধে বিশেষ হবে না। পরে, বন্ধু বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করে সুচিন্তিত যা হয় একটা কিছু ধীরে সুস্থে করা যাবে।

সালেমা একান্ত নিবিষ্ট মনে পোড়া আলুর খোসা ছাড়িয়ে রাখছিল। আগুনের আলোয় রাঙা, শীতের হাওয়ায় ফেটে যাওয়া তার মুখখানা শুকনো কমলালেবুর মত দেখাচ্ছিল। রহস্যময়ী নারীটিকে ইসমাইল এই-ই প্রথম ভাল করে লক্ষ্য করবার অবকাশ পেল। রংটা ফর্সা এবং গঠনটা সুন্দরও বটে।

গায়ের আঁটসাঁট ব্লাউজটা বেকায়দা এক জায়গায় ফেঁসে যাওয়ায় বিব্রত বোধ করছিল সালেমা। ইসমাইলের মনে হল বয়সটা ওর আঠারো উনিশ হবে। অর্থাৎ কম-সে কম তার চেয়ে বছর তিন চার ছোট হবে মনে হয়। তবে বয়সের অনুপাতে চেহারাটা কিছু রুক্ষ। প্রথম দর্শনে ইসমাইলের একবার মনে হয়েছিল যে মেয়েটি তালেবরদের ঘরের বাঁদী গোছের একটা কেউ হবে। কিন্তু বাঁদীদের এতটা সাহস হবে বিশ্বাস হয় না। এই বাঁদীদের বিষয়ে বহুবার সে সহানুভূতির সাথে ভাববার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু এদের সম্বন্ধে নিচু ছাড়া উঁচু ধারণা কেন যেন কোনও দিনও তার হল না। তবু, কাল থেকে কি এক গভীর চিন্তায় আত্মনিমগ্ন তার এই মুক্তিদাত্রীটিকে ইসমাইল যতই ভাল করে খেয়াল করে দেখেছে, ততই হাবে-ভাবে চাল-চলনে মেয়েটিকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের বলে মনে হচ্ছে।

—বাহে ?....অবশেষে একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল ইসমাইল—তোমার সোয়ামী ?

—বাহে....মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে সালেমা বলে —কপালটা মোর ভাঙছে বাহে !

—তা হইলে, গুজরান ?···ইসমাইল প্রশ্ন করল।

সালেমা, কি বলবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। ইসমাইল ফের জিজ্ঞাসা করল—কাজীরা তোমার কাঁয় হয় ?

ঘৃণায় সালেমার মুখটা একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। পোড়া আলু কয়েকটা ইসমাইলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সে ঝাঁজিয়ে উঠলো—শয়তানেরা ফের আমার কাঁয় হইবে ? কাঁয়ও নয়।

—তোমার বাড়ি ?....একটা আলুতে কামড় বসাতে বসাতে ইসমাইল প্রশ্ন করে।

—শাহবাজপুর।

—হামার বেলডাঙা মৌজার শাহবাজপুর ?

—হ বাহে! বেলডাঙা হইতে কোরোশ খানেক হইবে। মরা গাঙ্গের ধারে।

—মুই তা জানি……একটুখানি ঘনিষ্ঠতাবোধ নিয়ে ইসমাইল বলে—মোর বাড়িও বেলডাঙার লাগোয়া।

—আল্লায় মোক্ বাঁচাইছে বাহে! আর বাঁচাইছেন তোঁরা ....সালেমা চোখ নামিয়ে মাথাটা নিচু করে যেন তন্ময় হয়ে আগুনের শোভা দেখতে দেখতে কথাগুলি বলে গেল। সোয়ামী তার ছিল কাজীদের আধিয়ার। বেচারা মারা গিয়েছে আজ তিন মাসও পুরো হয়নি। সেই থেকে ছোট তরফের আজাহার কাজী, বেইমানটা যেন শয়তানের মত পিছু নিয়েছে। টাকা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে দেওয়ানীদের মুখ বন্ধ করেছে। অবশেষে দিন কয়েক আগে গুণ্ডা লাগিয়ে তার চাচাশ্বশুরকে মেরে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে, জোর করে টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় কি একটা মামলা মোকর্দমার জরুরি কাজে আজাহার কাজীকে শহরে যেতে হয়েছে। সেখানে গিয়ে সে অসুখে পড়েছে। যে রাতে তারা বেলডাঙা থেকে পালিয়েছে, সেই রাতেই, আজাহার কাজীকে আনবার জন্য মাইল কয়েক দূরে স্টেশনে গরুর গাড়ি গিয়েছে। পর দিন ভোরের ট্রেনে তার নামবার কথা।—তোমার সাথে না

পলাইলে বাহে আমার যে কি দশা হইতো! একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো দিয়ে আগুনটা খোঁচাতে খোঁচাতে সালেমা তার কথা শেষ করল।

পোড়া আলু চিবোতে চিবোতে খুব মনোযোগের সাথে ইসমাইল কাহিনীটা শুনছিল। একটা কলুষ স্পর্শ থেকে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছে জেনে তার মনটা কেমন যেন অদ্ভুত একটা তৃপ্তি ও আনন্দে ভরে উঠল। শুকনো পাতাগুলো খরখর শব্দে সামান্য একটু উড়িয়ে, ছোট্ট এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস শির শির করে শিষ দিয়ে বয়ে চলে গেল। সালেমা তার আলগা হওয়া আঁচলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিতে নিতে যেন সান্ত্বনা দেবার সুরে বললে....ষণ্ডাগুলোর হাতে তোমার খুব কষ্ট হইছে, বাহে! নয়?

—তোঁরা মোক্ ডাঙান দেখছেন, হ?···ইসমাইল একটু অপ্রতিভ হয়।

সালেমা কোনও কথা বলতে পারল না। অমানুষিক নির্যাতনের মাঝে ইসমাইলের স্বতস্ফূর্ত আর্তনাদের সেই গোঙানি বোধ হয় তার কানে বেজে উঠছিল। তার চোখ ফেটে ঝরঝর করে একটা ধারা গাল বেয়ে নেমে এল। গরম ছাইয়ের উপর তারই দু এক ফোঁটা পড়ে সাপের মত ফোঁস করে শব্দ হল। যেন একটা অদ্ভুত ভাল লাগায় ইসমাইলের বুকখানা ভরিয়ে তুলল। তবু প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করবার জন্য নরম সুরে সে বলল—তোঁরা খাইলেন না বাহে? খান তোঁরা।

সালেমা বসেই রইলো। সম্ভবত ইসমাইলের চোখের

সম্মুখে এমনি করে বসে খেতে তার একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। ইসমাইলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে নতুন একটা বড় গিঁঠুওয়ালা কাঠ আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ময়লাটা হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে, বিছানো খড়ের উপরে টান হয়ে, আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। পিঠের পেছনে আগুনের ওপাশে সালেমার উপস্থিতিটা সে অনুভব করছিল। ওর কাহিনীটাই তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। অতঃপর মেয়েটির কি গতি হবে! ভরা যৌবনে কপাল ভেঙে যাওয়া, গ্রামদেশের এমন বহু নারীর কথা সে জানে। গরু ছাগলের মত একজনের গোয়াল থেকে আর একজনের গোয়ালে এরকম কত মানুষের হাত ফেরি হয়ে যে তারা যৌবন শেষে জরাব্যাধি নিয়ে সব দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ধুঁকে মরছে, তা তো সে নিজে চোখেই দেখেছে।

ঘুমে ক্লান্তিতে ইসমাইলের চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল ঠিকই, কিন্তু কায়দা মতো শুয়ে শরীরটাকে যুতসই ভাবে আরাম দিতে সে পারছিল না কিছুতেই। পরনের তহবনটা এত খাটো যে পা দুটো কিছুতেই তার মধ্যে মুড়ে নেওয়া যাচ্ছে না। গামছাটাও নেই যে মাথায় জড়িয়ে নেবে কিংবা গা-টা ঢাকবে। এদিকে শরীরের যে ভাগটা আগুনের দিকে থাকে তা যেন আঁচ লেগে পুড়ে যেতে চায় অথচ অপর ভাগটা ঠাণ্ডায় স্যাঁতস্যাঁত করে। এই রকম সব নানান অসুবিধা, তবু একসময় কখন যেন তার চোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে এল। নেমে এল স্বপ্নের আমেজ। এই আমেজের কোন এক ফাঁক দিয়ে তার সমস্ত

শরীরখানা এক গভীর তৃপ্তির অতলে ডুবে গেল। মনে হল শীতকালের বেদনাজর্জর দেহখানা তার কে যেন মোলায়েম একটা কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। একটা পরম শান্তির অন্তঃস্তলে তার সমস্ত চেতনা বিলীন হয়ে গেল অবশেষে।

ইসমাইল বুঁদ হয়ে ঘুমোল। দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমোল। অবশেষে জ্বর যেমন গা থেকে আস্তে আস্তে ছেড়ে যায়, ঘুমটা তেমনি আস্তে আস্তে চোখ থেকে ছেড়ে গেল। সে চোখ মেলে খানিকক্ষণ বোকার মত চেয়ে রইল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল আগুনের অপর পাশে সালেমার শয্যাটা খালি। ধড়মড় করে সে উঠে বসতে গেল। কিন্তু আচমকা পেছন থেকে টান পড়ায় উঠতে পারলে না। সে কি? ইসমাইল চেয়ে দেখে তার পিঠের পেছনে শুয়ে সালেমা তার দেহটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে সালেমার শাড়ির যে আঁচল, উঠতে গিয়ে তাতে টান পড়াতেই এভাবে সে আটকে গেছে। এতক্ষণ ধরে তৃপ্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের আবরণে যে কিভাবে তার দেহখানা ঢাকা ছিল সেই কারণটা সবেমাত্র তার কাছে পরিষ্কার হল। কিন্তু এ সমস্ত কি ঠিক? ক্ষিপ্রভাবে অথচ খুব সতর্কতার সঙ্গে নিজের গা থেকে সালেমার আঁচলখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ইসমাইল সরে বসতে গেল। তবু সালেমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই স্বতস্ফূর্তভাবে সালেমা উঠে বসতে গেল কিন্তু আধা আলো আধা অন্ধকারে ইসমাইলের চোখে চোখ পড়তেই ধরা পড়ে গিয়ে একান্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে শুয়েই পড়ে রইল। ইসমাইলের দৃষ্টিতে ছিল একটা তীব্র জিজ্ঞাসা।

সালেমা চোখ ফিরিয়ে নিল। শেষ রাতের উজ্জ্বল তারাটা গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর ঔৎসুক্যের সাথে যেন জ্বলজ্বল করে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই তারাটির দিকে চেয়ে চেয়ে আস্তে আস্তে কৈফিয়তের সুরে সালেমা বললে —ঘুমের ঘোরে তোমার কাতরানি শুনি মোর দেলটা কেন জানি উতল হই গেছিল বাহে! মোক্ তোঁরা মাফ......মর্মাহত সালেমার গলাটা ভারী হয়ে ধরে এল।

ইসমাইলের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সমস্তখানি প্রতিরোধ তার একেবারে ভেঙে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে সে দু-তিনবার বলে উঠলো—না, না, না। তোঁরা তো কোনও অপরাধ করেননি।

—মুই তোমার উপর বড়ই ভরসা করছি...ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সালেমা বলে—তোঁরা থাকিতে মুই কি ভাসি যাইবো?

ইসমাইল ওর চোখের দিকে তাকাল। সালেমার দৃষ্টিতে যা ছিল তা কাউকে কোনও দিন ব্যাখ্যা করে দিতে হয়নি।

—হুঁ?...ইসমাইলের কাছে বিষয়টা এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতে নিজেও যে সে মনে মনে এতখানি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, তা পূর্বে সে টের পায়নি। তবুও সে একবার বললে—কিন্তু মোর সাথে তোমার গুজরান কেমন না হইবে?

—হামার মত মানুষের এ দুনিয়ায় একা একা থাকাতে বড়ই

বিপদ আছে। মুই সবটা দিক ভাবি দেখছি···সালেমার কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত।

সালেমার যে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি উভয়ই আছে এ বিষয়ে ইসমাইলের কোনও সন্দেহ নাই।—কিন্তু, কিন্তু···ইসমাইল তো তো করতে করতে বল্লে—আমার যে চাল নাই চুলা নাই···

—তোমার সেগুলা বিত্তান্ত মুই জানি···ইসমাইলের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিল সালেমা।

—কেমন করি জানেন?···ইসমাইল ঔৎসুক্য বোধ করে।

—রেলে তোমার কাম আছিল না?

—হ।

—গবরমেণ্টের সাথে কাজিয়া করিয়া তোমার চাকরি যায় নাই?

—কাজিয়া নয়···ইসমাইল সংশোধন করে দেয়—ষ্ট্রাইক করিয়া চাকরি গেইছে।

—সমিতির লোক নন্ তোঁরা?···সালেমার মুখে স্মিত হাসি।

—হ.তো···আশ্চর্য হয়ে ইসমাইল জিজ্ঞাসা করে—তোঁরা এত জানেন কেমন করিয়া?

—তোমার কথা না কইলে কাজীবাড়ির মানুষের পেটের ভাতই হজম হইবে না···সালেমার মুখে হালকা হাসি দেখা দিল?

—কি কয় ওমরা?···ইসমাইল বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠে।

—তোঁরাই দেশটাক্ না কি জ্বালাই খাইবেন, জমিদারী উচ্ছেদ করবেন, তালেবরদেক ধ্বংস করবেন···সালেমা বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে ওদের কথাগুলো বলে—গরিব গরবাগুলাকে তোঁরাই না কি উস্কানি দেওছেন, তোমার কথায়ই নাকি মুলুকের বেটিছাওয়াগুলা মরদের মত নাচানাচি করোছে! হ্যানো ত্যানো রাইতে দিনে কত বকর বকর! তোমার কথা না কইয়া ওম্‌রা ভাতই খাবা নাই।

—হ ?···ইসমাইলের মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি দেখা দেয়।

—তোমাক্ ওরা জবর ডরায়···সালেমা বলে—ওম্‌রা কয় যে গবরমেণ্ট তোমাক্ বরখাস্ত করিয়াই না কি পরগনার অশান্তি বাড়াইছে।

নিভু নিভু আগুনটাকে ইসমাইল খুঁচিয়ে ঠিক করে দিচ্ছিল। তার আরো কাছে ঘেঁসে এসে সালেমা বললে—ওমার বাড়ির তামান ওমার বিপক্ষে। চাকর কিসান দাসী বাঁদী তামান তোমার পাকে আছে। কয়, যে শুধু একবার বাধি গেলেই হয়···

আত্মবিশ্বাসের একটা নতুন বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হচ্ছিল। তার ভবিষ্যৎ কর্মধারা কেমনটা হওয়া উচিত তাই নিয়ে চিন্তা করতে করতে ইসমাইল কিছুটা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে করে সালেমা কি একটা কথা বলতেই তার চমক্ ভেঙে গেল। পাংশু মুখে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে ইসমাইল ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাল।

অস্ফুটভাবে ম্লানমুখে সালেমা কৈফিয়ত দিল—মোর

সোয়ামীর। ইসমাইলের নীরব প্রশ্নটা বোধ হয় তার চোখ এড়ায়নি। অপরাধীর মত তাই সে বললে—তোঁরা কি এই হতভাগাটাক্ ভালবাসিবেন না? ইসমাইল চট্ করে কিছু স্থির করে উঠতে পারছিল না। তবু হালকাভাবে হেসে উড়িয়ে দেবার মত করে বলে ফেলল—না ভালবাসিবো কেনে?

—মোর সোয়ামীটা ভালই আছিল...একটা ঢোক গিলে সালেমা বলে—তবে সাদাসিধা মুখ্যু মানুষ তাই। তোঁরা যত জ্ঞানের কথা জানেন, সেগুলো তো তার জানা ছিল না... কথাগুলো সালেমার আপনা হতেই থেমে গেল। শুধু চোখের কোণাটা তার ভিজে উঠল।

বহুক্ষণ চুপচাপ রইল ইসমাইল। তারপরে এক সময় গভীর মমতায় সালেমার মাথাটা কোলের উপরে তুলে নিয়ে তার চোখের কোণাটা মুছিয়ে দিয়ে, আঁচল দিয়ে ফের তার দেহটা জড়িয়ে দিল এমন ভাবে, মনে হল যেন সে একটা নিদ্রিত শিশুকেই আবরণ দিয়ে ঢেকে দিল অতি সন্তর্পণে।

কিন্তু ততক্ষণে পাখিগুলো কিচ্‌মিচ্ করে গাছে গাছে জেগে উঠেছে। ভোরের আবছা আলোয়, তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সালেমার দেহটা ঈষৎ বেঢপ মনে হওয়ায় পরম দায়িত্বশীলের মত ইসমাইল জিজ্ঞাসা করল—হাঁটিতে পারিবে তো?

—না পারিব কেনে?...সালেমা উৎসাহে ছেলেমানুষের মতো লাফ দিয়ে উঠে বসল।

তিনটি আদম সন্তানের এই ছোট্ট কাফেলাটি আবার তাদের অভিযান শুরু করল।

—খোদায় করে ঘাঁটার মধ্যে য্যান্ কোনও বিপদ আপদ না হয়!

পশ্চিম দিনাজপুর পেছনে ফেলে, রাজশাহী জেলার মধ্যে ঢুকে, খাড়া দক্ষিণে যেতে যেতে, ঠিক যেখানটায় এসে আত্রাই নদী সুস্পষ্টভাবে প্রায় পূবমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, সেই মস্ত বাঁকটার যেখানে আরম্ভ, ঠিক সেই জায়গাটিতেই হচ্ছে কাল্‌কেপুরের ঘাট। এই ঘাট থেকে বের হয়ে, যে রাস্তাটি পরাণপুরের মধ্য দিয়ে গিয়ে বটতলীর হাটের পাশ দিয়ে পশ্চিম মুখে বহুদূর চলে গিয়েছে, সেই রাস্তাটি ধরে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল মছিরুদ্দিন।

সময়টা তখন উনিশ শো পঞ্চাশ সালের শুরু। দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি। বাতাস থেকে পাটপচা জলের বিশ্রি গন্ধের শেষ রেশটুকু বহুদিন আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে তখন আখের রস আর পাকা ধানের মন মাতানো গন্ধের সৌরভে সমস্ত গ্রামাঞ্চলটা রম্ রম্ করছিল। শীতের দুপুর দেখতে দেখতেই গড়িয়ে যেতে চায়। রোদের কোনও তীব্রতা নেই, যা আছে তা হচ্ছে অতি সুখকর একটা উষ্ণতা। কিন্তু এই নেশা ধরানো মিঠে ভাবটুকু উপভোগ করবার মত মানসিক বিলাসিতার অবকাশ তখন

মছিরের মোটেই ছিল না। অন্ততপক্ষে কালামারার ঘাট পার হয়ে যেতে পারলে তবেই সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবে—তার আগে নয়। সেই অক্টোবর মাসের ধরপাকড়ের পর থেকে পুলিশ, টিক্‌টিকি আর জমিদার জোতদারের দালালদের দৌরাত্ম্যে মছিরের সহজ জীবন তছনছ হয়ে গিয়েছে। তার নিজের গ্রামে তো বটেই, আশেপাশের আট দশ খানা গ্রামে দিনের আলোয় তার বের হবার কোনও জো নেই। তাই, রাতারাতি ছয় সাত মাইল হেঁটে এসে, পরাণপুরের কাছে এক জায়গায় তার এক খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে সে উঠেছিল। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে, সেখান থেকে বের হয়ে বটতলীর হাটের উদ্দেশে পথ ধরেছে। হাটেই গফুরের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা—কি একটা জরুরি পরামর্শ করবার জন্য। গফুর লোক-মারফত তাকে ঐ তারিখে বটতলীর হাটে উপস্থিত থাকতে জানিয়েছে। গফুরের বর্তমান অবস্থাও তারই মতো।

হাঁটতে হাঁটতে মছির কালামারার ভাঙ্‌নার কাছেই এসে পড়েছিল। উত্তরে ছাত্‌রার বিল থেকে একটা খাড়ি বের হয়ে বইতে বইতে ঠিক এই জায়গা দিয়েই গিয়ে পড়েছে মান্দার বিলের মধ্যে। বর্তমানে জলের বেগ নেই। মৃদু একটা স্রোত ঝির ঝির করে চলেছিল শুকিয়ে-যাওয়া লাল খটখটে পাথারের মধ্য দিয়ে মান্দার বিলের সাদা জলমগ্ন প্রদেশের দিকে। রাস্তার ঐ ভাঙনধরা অংশটায় জল এখন যা আছে, তার চেয়ে কাদাই বেশি। জল পার হয়ে, হাত পা ধুয়ে,

আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থানটা মছির একবার দেখে নেয়।—নাঃ, আছরের ওখ্‌তো হয় নি কো—সে মনে মনে বলে—হাটে যায়েই নামাজ পড়া হোবে।

এবার মছির একটু গা ছেড়ে দিয়েই হাঁটে। এই খাস বরিন্দা এলাকার লোক কেউ আর তাকে চেনে না। রশি আলগ্যা পেয়ে এতক্ষণে, তাই তার ভাবপ্রবণ মনটা কল্পনায় ভেসে চলল। দূরে, ধুলো উড়িয়ে ক্যাঁচ কাঁচ শব্দ করতে করতে একটা পর্দাঘেরা মোষের গাড়ি চলেছে। বহুদিনের পুরানো একটা স্মৃতি মছিরের মনে পড়ে যায়। একবার তরফদারদের এক কুটুমকে নিয়ে সে এই পথ দিয়ে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, ধান কাটার মরশুমগুলোতে আরো বহুবার সে কাস্তে হাতে করে এই পথে রহনপুর পর্যন্ত গিয়েছে। সে জানে, বহুদূর পশ্চিমে গিয়ে এই পথটা এক জায়গায় মিশেছে দিনাজপুর গোদাগাড়ি সড়কে। সেখান থেকে দক্ষিণে চলে যাও—আমনুরা ইস্টিশানের ওপর দিয়ে চলে যাবে একেবারে গোদাগাড়ি ঘাটে। উত্তরে যাও—পোরশা-র মধ্য দিয়ে চলে যাবে বরাবর দিনাজপুর পর্যন্ত। তবে মছির নিজে অতদূর কখনও যায়নি। ওদিককার লোকের মুখ থেকেই এ সব কথা তার শোনা। তার যাওয়া আসা যা কিছু তা ঐ রহনপুরেরই আশে পাশে। ইদানীং অবশ্য ধান কাটতে সে আর ও সব মুলুকে যেত না। কারণ, নবাবগঞ্জ শিবগঞ্জের দিককার দিয়াড়া পাইঠেই ধান কাটার মরশুমটা আজকাল ওখানে গিজ গিজ করে। দেহে যে কালে ছিল রক্তের চঞ্চলতা,

মনে ছিল সদাই অহেতুক উন্মাদনা, সেই পরিপূর্ণ কৈশোরের সুখ-স্মৃতিতে বুঁদ হয়ে মছির বেশ একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে খট্ খট্ শব্দ হতেই, সে চমকে উঠে পেছনে চাইল। তাকিয়ে দেখে ঘোড়ায় চড়ে কে একটা লোক আসছে। তার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। যদি কোনও জোতদারের লোক হয়? বেকায়দা কোনও কথা যদি জিজ্ঞাসা করে বসে? না, বাঁচা গেল! লোকটা একটা মশল্লা-গুণ্ডি-দোক্তাপাতার দোকানদার, হাট করতে চলেছে। মছির একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু সত্যি! এমনি করে তো আর থাকা যায় না! খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আত্মীয় কুটুমেরা আশ্রয় দিতে ভয় পায়, রাতদিন দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা—এই কয় মাসেই সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে! কোনও মতে সহজ জীবনযাত্রাটা কি আর ফিরে পাওয়া যায় না?

মছিরের বয়স সম্ভবত বছর চল্লিশ পার হয়ে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। মুখে যা সামান্য দাড়ি, তাও নিরঙ্কুশ ভাবে আর কালো নয়। নিজের জমি মাত্র বিঘা তিনেক। দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাইকে তা আধি দিয়ে সে নিজে পাইঠ খেটে খায়। জীবনে তিন তিনবার সে অন্যের জমি আধি নিয়ে হাল করবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তিনবারই শেষ পর্যন্ত তাকে হাল ভাঙতে হয়েছে। দুবার বলদ মারা যাওয়ার জন্য এবং শেষবার পর পর দু-বছর অজন্মা হওয়ার জন্য। সেই থেকে তারও জীবন-স্বপ্নে ফাটল ধরেছিল। সে

ফাটল আর জোড়া লাগেনি। দেন মোহরের জন্য পর্যাপ্ত টাকার অভাবে প্রথম জীবনে বিয়ে করা হয়নি। বছর পাঁচেক আগে, খুব উঠে পড়ে সে একবার নিকের জন্য চেষ্টা করেছিল, তাও শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গিয়েছিল। দেহ নিস্তেজ, মন অবসন্ন, বিষাদে জীবনের সমস্ত স্বাদ তেতো হয়ে উঠেছে। এমনই সময়ে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বন্যার জোয়ারের মতো কৃষক সমিতির আন্দোলনের ঢেউ উঠে এসে একদিন তাদেরই গ্রামে ধাক্কা মারল। কেমন করে যেন মছির সেই আন্দোলনের সঙ্গে দিনে দিনে জড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে পাশের গ্রামের যুবক সাদেক আলির সংস্পর্শে এসে তার চোখের সামনে এক নতুন দুনিয়ার দরজা খুলে গিয়েছিল। জমিদার জোতদারদের অত্যাচার উৎপীড়নের দিন শেষ হয়ে যাবে, কৃষকদের হাতে আসবে জমি! সারা মাঠের ফসল আর গিয়ে উঠবে না বিশ্বাস আর তরফদারদের গোলায় অথবা ভকত্‌দের খামার বাড়িতে! তার বদলে কৃষকদের ঘরে ঘরে .ফসল! বছরের খোরাকের ভাবনা নেই, নেই ক্ষুধা আর কান্না, পেট ভরে দুবেলা ভাত! খই চিড়ে মুড়ি মুড়কি পিঠে আর পুলি, ছোট ছোট ছেলেরা খাবে আর আঙিনায় নেচে নেচে বেড়াবে! দেখতে দেখতে গড়ে উঠবে রাস্তা-ঘাট, এক কোমর জলের মধ্য দিয়ে বর্ষাকালে খপর খপর করে হাটে যাওয়া আসা করতে হবে না! তল্লাট জুড়ে খুলবে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, বসবে ইস্কুল! গ্রামে গ্রামে খেলার ময়দান! রাত লাগতেই আলো ঝলমল নাট্যশালা! ভাবতে ভাবতে মছিরের চোখ

ফুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত'। কিন্তু সেই সময়ে সে বুঝতে পারেনি এই স্বপ্ন সফল হওয়ার পথ এত রকম কাঁটায় আচ্ছন্ন, ভাবতে পারেনি এই পথ চলায় এতখানি ধৈর্যের প্রয়োজন। ধরপাকড়ের ভয়ে লোকে আজ একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। মিটিং মিছিলের পুরানো জলুষ আর নেই। কারো বাড়িতে গেলে সহানুভূতি আজো পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তারা উপদেশ দেয় যে, অবস্থাটা একটু সামাল দেবার জন্য কর্মীদের পক্ষে দিন কতক ভিন্ জায়গায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। অন্য তো কিছু নয়! এই যে, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না, সদাসর্বদা একটা দুশ্চিন্তা, দিনের বেলা হলেই আশ্রয়ের সমস্যা, এই অবস্থাই মছিরকে পাগল করে তুলেছে। —দেখা যাক গফ্‌রা কি কয়!···মনে মনে কথাটা একবার বলে যে জোরে জোরে পা ফেলে।

হাট তখনও জমে ওঠেনি। মছির পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে ওজু করে জুম্মার ঘরে ঢোকে। নামাজ শেষ করে, পুকুরের ওপারে যেখানে হাঁস-মুরগির হাট বসেছে, সেখানে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার মতলব করে। এমন সময়ে গফুরের দেখা।

—ক্যা চাচা! কতক্ষণ? এক্কেবারে এ্যালায়ে গেলা যে?

—এখনই আইনু রে বাপু!···মছির জবাব দেয়—কেবলই ধমক্ সামলায়ে নিচ্ছি।

—তুমি এটে থাকে নইড়ো না য্যান্। হামি কিছু

জলপান কিনা নিয়া আসি। কাল রাইত্ হতে প্যাটে একেবারে কিচ্ছুই পড়েনিকো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গফুর গামছায় বেঁধে খানিকটা মুড়িমুড়কি কিনে নিয়ে আসে। দুজনে মুখোমুখি বসে তাই চিবোতে শুরু করে।

—জানে তো আর সয় না চাচা……গফুর প্রায় ভেঙে পড়ার মতো—হায়রে আল্লা! কোটে থাকিলো হামার বাড়ি ঘর, আর কোটে হামি! নিন্দ্ নাই, গোছল নাই! মাশ্না-লাগা মান্ষের লাকান পাঁথারে পাঁথারে আজ ঘুরে ঘুরে মরিচ্ছি হামি ……বলতে বলতে গফুর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

গফুরের বয়স বছর পঁচিশেক হবে। খানিকটা চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে সে। কিন্তু সাদেক আলির প্রভাবে আর আন্দোলনের জোয়ারের মুখে সে এসে এদের দলে যোগ দিয়েছিল। আজ একেবারেই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঘরে ফেলে আসা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর কথা যখন তার মনে পড়ে যায়, তখন সে প্রায় দিশেহারা হয়ে ওঠে। এমন কি সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে সেই কথা মুখ ফুটে বলতেও তার দ্বিধা হয় না।

হাটের মধ্যে ভালমন্দ নানান রকমের লোকই তো আছে, কে কোথায় কি শুনে ফেলে, মছির সে জন্য খুব উদ্বিগ্ন বোধ করে। গলা খাটো করে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু নরম স্বরে বলে—বল তো গফরা! তুই কি করবু বল! খোদায় যদি মারে তো কে ঠেকায় বল দিনি?

—আমার জীউ-এ আর যে কুলায় না !……গফুরের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। কথাটা আর্তনাদের মতই শোনায়।

মছিরের মানসিক অবস্থাও তো প্রায় ঐ রকমই। কিন্তু তবুও অধৈর্য হয়ে চেঁচামেচি করলে তো আর চলবে না।—তাই বলে পাগলা ক্ষ্যাপার মতো চেঁচামিচি করবু কি জন্যে……মছির একটু সংযত ভাবে বলে—কোনও বুদ্ধি যদি থাকে, তো তাই কও।

গফুর অধৈর্য হয়ে বলে—হামি বাড়িত্ যাবো —

—অবশেষে এক্কেবারে শ্বশুরের বাড়িত্ নিয়া যায়ে যদি তোক্ শিলায় ?

—হামি আগেই দারোগার কাছে যায়ে হাজিরা দিবো !

মনে হল, গফুর যেন একটা স্থিরীকৃত সংকল্পকেই ব্যক্ত করল।

কথাটা শুনে মছির প্রথমে একটু থ হয়ে গেল। সেও বহু সময়ে অনেক রকম ভাবে অনেক কথা ভেবেছে, কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করে সমস্যা সমাধানের কথাটা তো একবারও তার মাথায় আসেনি।

—রাইতে আঁধারে ঘুরে ঘুরে, তোমাক্ হামাক্ দিয়া কোন কামডা হোচ্ছে তাই শুনি দিনি চাচা ?…গফুরই আপনা হতে পাল্টা প্রশ্ন করে বস্‌ল।

প্রকৃতপক্ষে তারা যে বর্তমানে বেফয়দা ঘুরে মরছে, একথাটা মছিরের মনে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে, ধরা দিয়ে জেলের মধ্যে বসে বসে পচাতেই বা কি ফয়দাটা আছে ?

—দারোগায় যদি তোমাক্ কয়েদ করে রাখে ?······প্রশ্ন করল মছিরুদ্দিন।

—কান্নাকাটি করবো। হামার ভালমন্দ কোনও আপত্তি যদি না-ই শোনে, না হয় দু তিন মাস ফাটকের মধ্যে রাখবে হিনি, এই তো ? অবশেষে তো খালাস পায়ে খসে আসা যাবেই।······ দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচিৎ করে খানিকটা থুথু ফেলল গফুর।

দারোগারা দয়াধর্ম করবে কি না এ বিষয়ে মছিরের ঘোর সন্দেহ। কিন্তু তবুও গফুরের কথাটা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। দু তিন মাস আটক থেকেও পরে যদি এসে লোকের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যায় তা হলে কথাটা খুব খারাপ নয়। বিশেষ করে এখন তো আসলে সবাই বেকার—কিছু তো করা হচ্ছেই না, কি আন্দোলন যে করবার আছে না আছে, 'তাও তো সঠিক কেউ বলতে পারছে না।

—যাবে তো চলো চাচা !······গফুর যেন একেবারেই স্থির সংকল্প।

—কোন্ ঠে ?

—থানাত্।

মছির চমকে উঠল। এক্ষুনি ? এই মুহূর্তে ? এত বড় একটা সিদ্ধান্ত কি হঠাৎ করে নেওয়া সম্ভব ?

—ধন্দো মারে গেলা যে! মত করো তো হামার সাথে ঘাঁটা ধর। মত না করো, হামাক্ আর আটকায়ে রাইখো না ······গফুর আবার তাড়া লাগায়।

—সাদেক আলির সাথে কি একটা কথা বলা দরকার আছিলো না ?....মছির করুণ ভাবে তাকাল।

—তো তুমি থাকো। সাদেক আলি নিজেও যাবে না— হামাদের যাওয়া মঞ্জুর করবে না।

—সাদেক আলিক্ কি খবর করা হোছিলো ?

—হামি নিজেই তো অর সাথে দেখা করিছিলাম। অর বিবেচনায় ইডা করা বুলে ঠিক লয়। আর নিজে তো ঐ কাম করবেই নাকো। মান্‌ষে বুলে খারাপ কইবে। কইলো,— হামার বুড়াক তো জানো, উঁই যে সে গোঁয়ার লয়। এই কাম করলে উঁই-ই হামার বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিবে না।

মছির মাথা নাড়ে, কথাটা মিথ্যা নয়।

মছির জানে বুড়ো তার বেটা সাদেক আলিকে একথা একদিন বলেও ছিল যে, এসব হচ্ছে মরদের কাজ। মরদের হিম্মত বুকে নিয়ে এসব কাজে নামো তো ভাল। হিম্মত না থাকে, নেমো না! কিন্তু একবার মাথা দিয়ে এসব কাজ থেকে পিছু টান দেওয়া চলবে না। বুড়ো সৎ বটে—কিন্তু সত্যিই খুব গোঁয়ার।

মছিরকে চুপচাপ দেখে গফুর বড় বিরক্তি বোধ করে। ধমক দেবার মত করে ফের সে তাড়া দেয়—তোমার মনডা কি কয়, তাই হামাক্ খোলসা করে কও।

—কিন্তু, যাও তো নগাঁও চলো।......মছির আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—ওটি হাকিমের কাছে যায়ে সব কথা কওয়া হোক।

—ক্যান্ এ'টে ?...জেরা করবার মতো করে বললে গফুর।

—এ'টে গেলে জহির বিশ্বাস যা বুদ্ধি দিবে দারোগায় ঠিক তা-ই করবে। হামরা জহির বিশ্বাসের ব্যাগার বন্ধ করিছি। উঁই যদি তোমাক্ হামাক্ একবার নাগালের মধ্যে পায়, তবে যে কি করবে তা আর কওয়া লাগবে না।

শহরের হাকিম হুকুমের মন মেজাজ কিরকম অনুকূল হবে না হবে তা ঠিক ধারণা করতে না পারলেও, গফুরের চোখের সামনে জহির বিশ্বাসের একটা হিংস্র চেহারা ভেসে উঠল, আর ভেসে উঠল দারোগা পুলিশের সাথে তার গভীর মিল-মুহব্বতের ছবিখানা। কিন্তু সে তো স্বেচ্ছায়ই ধরা দিতে যাচ্ছে। দারোগা কি সে কথাটা বুঝবে না? যাই হোক, মছিরের পীড়া-পীড়িতে স্থির হল যে এখানে নয়, ধরা দিতে হলে একেবারে নওগাঁ শহরেই যাওয়া উচিত।

হাট তখন ভাঙা ভাঙা। মানুষ জন অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। এবার উঠতে হয়। মছিরের আবার মাগ্‌রেবের নামাজের সময় হয়ে গেছে। গফুর বিরক্ত বোধ করে—তোমার লাকান্ মুসল্লী মান্‌ষেক্ নিয়া রাস্তা ঘাঁটায় বাপু জবর মুস্কিল।

মছির একটু কুণ্ঠিতই বোধ করে। দুনিয়ার হাল চাল দেখে-শুনে খোদার উপর তার আস্থায় ফাটল ধরেছিল। কিন্তু তবুও দীর্ঘকালের একটা অভ্যাস, পাঁচ ওখ্‌তো নামাজ না পড়লে মনটা তার যেন একটু খুঁত খুঁত করে। তা ছাড়া সামান্য একটু সময় নামাজের জন্য ব্যয় করা এমন একটা কিছু অসুবিধার নয়। ঈষৎ হেসে ওজু করবার জন্যে সে পুকুর ঘাটে যায়।

অনেক মাথা কুটোকুটি করে চুলচেরা বিচার বিবেচনার পর

তারা ঠিক করল যে, সন্ধ্যা রাতেই তাদের কাল্‌কেপুরের ঘাট পার হয়ে যেতে হবে। রাতটা ওপারে আশে-পাশের কোনও গ্রামে কাটিয়ে, ভোর রাতে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে, সূর্য ওঠার আগেই তারা যোদ্‌বাজার বন্দর পার হয়ে যাবে। তারপর সেখান থেকে নৌকা ভাড়া করে নওগাঁ যাবার যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, ঘাট পার হতেও বিশেষ কোনও বেগ পেতে হল না। সমস্যা হল তাদের রাত কাটানোর জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা পাওয়া নিয়ে। খোঁজাখুঁজি করতে করতে অবশেষে আশাতিরিক্ত একটা উপযুক্ত জায়গাও মিলে গেল। নদীরই ধারে পথের ওপরে একখানা মোষের গাড়ি ধুরি ভেঙে পড়েছিল। ছইটাও তার বেশ ভাল। গাড়িওয়ালা সম্ভবত তার মোষ জোড়া নিয়ে রাতের মতো পাশেই গ্রামের ভেতরে কোনও জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। ফুরসুৎ মতো মছির এষার নামাজ সেরে নিয়েছিল। গফুর আর মছিরুদ্দিন গাড়ির মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া স্থির করল।

কিন্তু ঘুম কি আর আসে? পেটে ভাত নেই। তাতে শীতের রাত্তির। নদীর হাওয়া এক একবার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি তুলে দিয়ে যায়। দুইজনে জড়াজড়ি করে কোনও মতে শুয়ে থাকে। নদীর ওপারে কিছুদূরে এক জায়গায়, খুরশালে আখের রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হচ্ছিল। নতুন গুড়ের সুন্দর একটা গন্ধ এপার পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে আসে—বুভুক্ষু গফুরদের জিভে জল আসবার উপক্রম হয়। লোকজনের হাসি,

টুকরো টুকরো কথাবার্তাও মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসে। কিন্তু সব চাইতে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল তারা তখনই, যখন চোখ খুললেই খুরশালের সেই অগ্নিময় উষ্ণ পরিবেশটুকুর দূরবর্তী দৃশ্যটা বারে বারে তাদের চোখে পড়ছিল। নদীর কিনারেই পাতা খাওয়া-জালের কাছে একখানা ছোট জেলে ডিঙি রাখা ছিল। গফুর তো একবার প্রস্তাবই করে বসল, ওপারে গিয়ে খুরশালে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু মছির কিছুতেই রাজি নয়। সব লোক তো আর সমান নয়! কাছেই থানা পুলিশ আছে, কখন কি হয় কেই বা বলতে পারে? গফুর কিন্তু মছিরের এত গোঁয়াতুর্মির কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না। যখন হাকিমের কাছে ধরাই দিতে যাওয়া হচ্ছে, তখন এত চুপিচুপি করবার কি মানে থাকতে পারে?

শেষ রাতে মছির গফুরকে ঠেলে—ওঠ, ওঠ!

—কি, রাত ফর্‌সা হোছে?······গফুরের চোখের পাতা সবে মাত্র ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল, সে বেশ একটু বিরক্তি বোধ করে।

—রাত ফর্‌সা হওয়া লাগবে, তবে তুই রওনা হবু?······ মছির ধমক দিয়ে ওঠে—দেখতুছু না, পোহাতি তারা আকাশে কোন ঠাঁই জ্বল্ জ্বল্ করতিছে? রাত ফরসা হবার দেরি আছে ক্যা?

দুইজনে উঠে নদীর পার দিয়ে রওনা হয়। মনে হল, ভোর রাতের নিভু নিভু তারা বুকে ধরা ধূসর সুন্দর আকাশখানা এই বেরসিক লোক দুটোর দিকে চেয়ে যেন একটু ম্লান অভিমানের হাসি হাসল। কিন্তু তাদের তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার

মত অবসর নেই। প্রাণপণে তারা হেঁটে চলল। তবুও যোদ্‌বাজার বন্দরে পৌঁছানোর আগেই রাত ভোর হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্যে থেমে, সুবহ্‌ সাদেকে ফজরের নামাজ পড়ে নিতে অবশ্য মছিরের কিছুতেই ভুল হল না।

ভাগ্য ভাল, বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে একটা নৌকা পাওয়া গেল। তা, সে নৌকা আবার নওগাঁ যাবে না, যাবে ত্রিমোহিনী পর্যন্ত। হোক, তাই হোক। ওরা দুই জনে ভাড়া মিটিয়ে নৌকায় চড়ে বসল।

নৌকা ভাটিয়ে চলল।

বাঁদাইঘাড়া বন্দরের কাছে ঘাটে নৌকা লাগিয়ে মাঝি যখন জলপান কিনবার জন্যে বাজারের মধ্যে গেল, সেই সুযোগে মছির বললে—এ গফ্‌রা, কামডা কিন্তুক খুব বিবেচনার কাম হোল না রে বাপু—

—ক্যা ?

—মান্‌ষে কি কইবে রে বাপু! পুলিশের খানাতল্লাশিত্‌ মান্‌ষের বাড়ি থাকে ধরা পড়ি—ধরা পড়ি, সে হোচ্ছে এক সতন্তর কথা। অনাশৃন্তি, যাচে যায়ে ফাঁদেত্‌ পড়া....

—মান্‌ষে কোবে নি!......গফুর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে—তবে, এখন মান্‌ষে খাবার ভাত দেয় না ক্যা? শুইবার ঠাঁই দেয় না ক্যা ?

—মান্‌ষে তোমাক্ হামাক্ যাচাই করে নিবে না? মছির ফুঁসে ওঠে—বাজায়ে নিবে না হামরা লোকগুলা খাঁটি কি মেকি ?

—ওরে হামার বাজানাআলারে! বুঝিছি, সাদেক আলির মন্তর তোমাক্‌ও লাগিছে।

মছির কি যেন একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। গফুর আবার সেঁটে উঠল—অর সাথে হামারও নাচা লাগবে? অর কি? ভাল মানুষ একটা শ্বশুর পাইছে, বৌটাক্‌ শ্বশুর বাড়ি রাখে দিছে। ভাত-কাপড়ের ভাবনা নাই। নিজেও মধ্যে মধ্যে যায়ে, দিব্যি আরামে বৌয়ের উশুমে উশুমে শুয়ে ঘুমায়ে রাত কাটাচ্ছে। অর কি?

ঈর্ষায় গফুরের মস্তিষ্কটা যেন শুকিয়ে চড়চড় করে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ মাঝি এসে পড়ায় ওদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। সাদেক আলির অবশ্য সত্যিই কিছু কিছু সুবিধা আছে। কিছু বাড়াবাড়ি হলেও, গফুরের কথাটাকে মছির একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না।

ত্রিমোহিনী পৌছুতে পৌছুতে জোহরের বেলা হয়ে গেল। মাঝিকে ভাড়ার পয়সা চুকিয়ে ওরা নৌকা ছেড়ে দেয়। দেশ থেকে এত দূরে কে আর তাকে চিনবে? একটু ছাড়া পেয়ে গফুর নিজেকে বেশ খানিকটা হাল্‌কা বোধ করছে। কতদিন যে জলে গা ডুবিয়ে ভাল করে স্নান করা হয়নি! চুলকানি পাঁচড়ায় শরীরটা যেন পচে যাবার উপক্রম হয়েছে। তহ্‌বনটা ছেড়ে, গামছা পড়ে জলে নেমে সাঁতার কেটে মনের আনন্দে সে স্নান করতে লাগল। মছির তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সামান্য দূরে একটা জুম্মা ঘরে নামাজ পড়তে গেল।

নামাজ সেরে, মসজিদ ছেড়ে বড় সড়কের উপর পা

দিয়েই দূর থেকে মছির দেখতে পায়, রাস্তার ধারে সাদা চুল সাদা দাড়িওয়ালা কে এক বুড়ো দুহাতে মাথা ধরে মাটিতে বসে পড়ে ওয়াক্ ওয়াক্ করে বমি করছে আর মাঝে মাঝে কি যেন সব বলছে। প্রায় দশ বারো জন লোক তার চার পাশে ভিড় জমিয়েছে। মছির উদ্বিগ্নভাবে এগিয়ে গেল।

—হা খোদা! হায় আল্লা মেহেরবান্! হামার ছ্যাশের এ কি হোলো!······সে যেন একটা বুকফাটা আপশোস। দিন কয়েক আগে বৃদ্ধ গিয়েছিল তার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি রেখে আসতে। জায়গাটা জয়পুর হাট স্টেশন থেকে সামান্য কিছু দূরে। ফিরছিল সকালে আসাম মেইল-এ। পথে সান্তাহার স্টেশনে ট্রেনের মধ্যেই কাটাকাটি। সে কি একটা দুটো খুন জখম? নিরীহ ধর্মভীরু বুড়ো মানুষ সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। চোখ খুলে থাকলেও সব সময়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে গাদা গাদা লাশ আর খুন! চোখ বুজলেও সেই লাশ আর খুন! দানা মুখে দিতে পারছে না—পানি মুখে দিতে পারছে না! গায়ে জ্বর এসে গেছে—হাঁটতে পর্যন্ত পা থর থর করে কাঁপছে!—হায় রে দিশাহারা মানুষের আর্তনাদ······বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো—হায় খোদা, জানে শুনে তো কোনও গোনাহ্ হামি কোনও দিন করিনিকো, তবে এ কি শাস্তি হোলো হামার! একটা অবলা দুধের ছাওয়াল, তাকো অরা······হায় হায় হায়!

একটা চাবুক খেয়ে মছির যেন চমকে উঠল। সর্বনাশ! এই তো সেই শয়তানটা আবার ছাড়া পেয়েছে! এই তো

সেই উন্মত্ত হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটির হাওয়া আবার আরম্ভ হল! ক'দিন আগে গ্রামে মিটিং-ফেরতা লোকের মুখে এনায়েৎ মুন্সীর হিন্দু বিরোধী বক্তৃতার বিবরণগুলি শুনে, এই রকম একটা আশঙ্কার কথা তার যে একবার মনে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু তখন ব্যাপারটার তাৎপর্য অত গুরুত্ব দিয়ে সে বোঝেনি। একটু ঝিম্ ধরে থেকে, হন্ হন্ করে সে নদীর ধারে যেখানে গফুর অপেক্ষা করছিল, সেখানে চলে গেল।

—হামার আর যাওয়া হোল না রে গফ্‌রা!

—ক্যা?······গফুর একেবারে হতবাক্।

—না। চারিদিক আবার হেঁদু-মোছলমান কাটাকাটি বাধে গিছে। হামারে এখন দ্যাশ আগ্‌লান লাগবে।

—দেখ্ চাচা······গফুর তিরস্কার করে ওঠে—তোর অত শত বাহানা হামার পছন্দ হয় না। তুই যে যাবু না—অত ঘুপ্পচুপ দেখে কালই হামি সে কথা টের পাছিলাম।

মছির উত্তেজিত হল না। শুধু ধীরে আবেগভরা গলায় একবার বলল—খালি তো মোছলমানই লয়, কত সাঁওতাল বুনা, কত হেঁদু গরীব গরবা হামার সমিতির মেম্বর। হায় খোদা রহমান! হামার একতা য্যান না ভাঙে—হামার সমিতির মুখেত্ য্যান চুনকালি না পড়ে!

একটুখানি থেমে ফের সে বলল—তুই যা গফ্‌রা। হামার আর যাওয়া হয় না।

গফুর বিরক্ত হয়ে একলাই নওগাঁর রাস্তা ধরল।

দিন সাতেক পরের কথা। চৌবাড়ার হাট। সাদেক আলি আর মছিরুদ্দিন এবার একটু বেশি ঝুক্কি নিয়ে হাটে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উদ্দেশ্য—সমিতির কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দলটা একটু ভাল করে গুছিয়ে তুলবার চেষ্টা করা—নিজেদের করণীয় কাজগুলি স্থির করে নেওয়া। হঠাৎ গফুরেরই সঙ্গে দেখা।

—ক্যা রে গফ্‌রা !······মছির অবাক হয়ে যায়।

—এই তো, তোমাদের জন্যেই এ হাট সে হাট ঘুরে ঘুরে পাঁচটা দিন হয়রান হনু······গফুরের মুখে হাসি।

—তুমি বুলে নগাঁও গেলেন ?······সাদেক আলি কৌতুকের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

—হয় বাপু !···গফুর ভঙ্গি করে বলে—তোমরাই গেলেন না। তোমরা মঞ্জুর না করলে একা একা খামাখা সে কামডা করা যায় ক্যা ?

—বুঝলে চাচা······সাদেক আলির মুখখানা বিজয়ীর মতো একটা তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—হামার সমিতির এই নিশানডার ক্যাম্‌ বা একটা যাদু আছে !

টিউব্ ফেটে হুস্ করে পাম্পটা বের হয়ে যেতেই, নিরুপায় আজিজ বাধ্য হয়ে ব্রেক কষে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। বড়ই বিরক্ত বোধ করল সে। জানোয়ার বিগ্ড়ালে, রাগ করে দু'ঘা বসানো যায়, বাগেও আনা যায়। কিন্তু যন্ত্র যদি ভাল মতো বিগ্ড়ায় তবে বড়ই মুশ্কিল। বিকল যন্ত্রটির নিস্পৃহতায় যতই প্ররোচিত হও না কেন, দু'ঘা কষে দিয়ে মনের ঝাল মিটানোর উপায় নেই, বিরক্তিতেই গুমরে গুমরে মরতে হবে সোয়ারীকে। যাই হোক, সাইকেলটা হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা কাঁঠাল গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সেটা দাঁড় করিয়ে, কোথায় কি হয়েছে, চাকাটা ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আজিজ নিচু হয়ে আলগোছে মাটিতে বসল। বাড়িটা তার এখান থেকে এখনও পুরো মাইল চারেক পথ হবে। সুতরাং টায়ারখানার এ জায়গা সে জায়গা টেপাটেপি করতে করতে নিবিষ্ট মনে সে ভাবছিল কোনও ঠেকা চালানোর মত বুদ্ধি একটা কিছু বের করা যায় কিনা। এমন সময় পিঠের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কে জিজ্ঞাসা করল—কে বাহে, আবদুল আজিজ ?

আজিজ মুখ তুলে দেখে ছাতা বগলে বাহার মোল্লা। চুলদাড়ি কাঁচায় পাকায় প্রায় সমান সমান, বাহার মোল্লা সম্পর্কে

আজিজের এক রকম মামা হয়। একই গাঁয়ে বাড়ি দুজনার। সে ময়লা হাতখানা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—বাহার মামু হ'! তা ছাতা বগলে এতবেলায় কোনঠে যাওছেন?

—হ', সূর্য উঠার এক ঘড়ি আগেই রওনা হইলে ভাল হইল হায়। তা যাউক, দেখা হইছে, খোদায় রহম করছে। মুই তা হইলে শহর বুলে এ্যালায় রওনা দিনু······ছাতাটা এক বগল থেকে আর এক বগলে নিতে নিতে, মস্ত একটা যেন অবশ্য করণীয় কাজ সুসম্পন্ন হল এই রকম একটি স্বস্তির ভাব নিয়ে বাহার বললে—নাগাল না পাইলে খবর করার জন্য তিন কোরোশ হাঁটি ফের তোমার ফুফুর বাড়ি হামার যাওয়া লাগিল হায়। তা হউক, তাড়াতাড়ি বাড়িত্ যান তোঁরা। লছমন্ ভাইটা মারা গেইছে। দাফন কাফনের কি বিহিত করা হইবে, কর! আজ মামলার তারিখ, মোর তো আর থাকা হয় না।

এক নিঃশ্বাসে কথা কয়েকটা শেষ করে, কাঁধের উপরে পাঞ্জাবির পট্টিমারা জায়গাটা চাদরখানা দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বাহার মোল্লা হন্‌হন্ করে হাঁটা দিল।

সপ্তাহ খানেক মাত্র সে বাড়ি ছিল না। এর মধ্যে এই ঘটনা! খবরটার আকস্মিকতায় আজিজ একটুখানি হতভম্বই হয়েছিল। বাহার মামু রওনা হতেই তার সম্বিৎ ফিরল—আরে ও মামু, খাড়া হও······আজিজ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল—লছমন্ ভাইটা মারা গেইছে কখন?

—মারা গেইছে, বোধ করি আগা রাতে। কিন্তুক্ টের পাওয়া গেইছে সকালে······মিনিট খানেকের জন্যে বাহার মোল্লা

মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। অসুখ মাত্র চার পাঁচ দিনের। তবে গত দু'দিন হল খুব বাড়াবাড়ি হয়। রোগটা কি ভালমতো বোঝা গেল না। কাল সকালে খয়ের মুন্সীরা গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে দেয়। সাঁঝেও আবার তারা দেখা করেছিল। লছমন ভাই ওদের আজ সকালে ফের দেখা করতে বলেছিল। কিন্তু ভোরবেলা খয়ের মুন্সী, আমীর চাচা এরা সব তার সাথে দেখা করতে গিয়ে বেকুব! লছমন্ ভাই তখন আর বেঁচে নেই! এখন কি যে করা হবে সেইটে হয়েছে সমস্যা। কেউ বলছে, ও লাশ ছোঁওয়া দোরস্ত, কেউ বলছে দোরস্ত নয়; কেউ বলছে গোর দাও, কেউ বলছে আগুনে দাহ কর। এরকম নানা মুনির নানা মত। দেওবন্দ্ই মওলানা, এমাদ হাজা সাহেব কি হেদায়েৎ করেন তা শুনে আসবার জন্য লোক গিয়েছে। গাঁয়ের একমাত্র কলেজে পড়া ছেলে বিচক্ষণ আবদুল আজিজের পরামর্শও একান্ত অপরিহার্য। মায়, মুরুব্বিরা পর্যন্ত তার জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করছে। টেলিগ্রামের মত কাটা কাটা কথায় সমস্ত খবরটা এক নিমেষে পরিবেশন করে, ফের হাঁটা শুরু করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাহার মোল্লা বললে—তা হউক। খুব তাড়াতাড়ি যান। কি করা হয় জোহর ওখ্তের আগেই করি ফেলাও গা।

লছমন ভাইটা তাহলে মারাই গেল! ছেলেবেলা থেকে আজিজরা তাদের গাঁয়ে এই লছমন ভাইকে দেখে আসছে। সৎ এবং বিশ্বাসী বলে সর্বজন সমাদৃত এই মানুষটি বোধ হয় প্রায় বছর ত্রিশেক ধরে তাদের গ্রামে কাটিয়েছে। পাকা

একজোড়া গোঁফ। কালো মুখখানায় ততোধিক কালো ডাগর ডাগর চোখ দুটোয় পিট্‌পিটে হাসি। ছেলে বুড়ো বৌ বেটি সকলের সাথেই যখন তখন রসালাপে মশ্‌গুল, এই বুড়োটি গ্রামশুদ্ধ মানুষকে ভালবাসা দিয়ে যেন যাদু করে রেখেছিল। লছমন ভাইয়ের কথা বলার ঢঙটা চোখ বুজলেই যেন আজিজের কানে বেজে উঠছে। সে হয়তো কারো গাছতলার আড্ডায়, বাঁশের মাচায় বসে হিন্দুস্থানী ঢঙে বাংলা ভাষায়, কখনও বা দু'একটি হিন্দি শব্দ মিশিয়ে পরীরাণী গুলে-বকৌলীর কাহিনী শোনাচ্ছে ; নয়তো, হাত পা নেড়ে দেখাচ্ছে বুড়ো জটায়ু পাখি কিভাবে অবলা নারী সীতাকে রক্ষা করবার জন্য দুরাত্মা রাবণের সাথে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিচ্ছে। এই সব টুক্‌রো টুক্‌রো কথা। মনটা আজিজের বাস্তবিকই খানিকটা উদাস হয়ে গেল। কাঁঠাল গাছটায় মুকুল ধরেছিল। তারই প্রাণ মাতানো গন্ধে চারিদিক উতলা করে তুলেছিল। সাইকেলটা ঠেস্ দিয়ে বহুক্ষণ আজিজ সেখানেই আত্মনিমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ একখানা হালকা সাদা মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করাতে, সচকিত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে তার হুঁশ হল, বেলা তো বেড়ে যাচ্ছে! সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সাইকেলটায় মনোনিবেশ করল। কিন্তু কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পরে, অগত্যা একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হাতে করে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতেই নিজ গ্রাম অভিমুখে পায়ে হেঁটে সে রওনা দিল।

ছাপড়া জেলার এই লছমন পদ্মা-তিস্তার মাঝখানে

পূর্ববঙ্গের সুদূর এক পল্লীগ্রামে কি ভাবে আর কেনই বা ছিট্‌কে এসে পড়েছিল, বিশ্লেষণ করে তার কোনও একটি মাত্র কারণ খুঁজে বের করা খুবই দুরূহ কাজ। তবে সবাই দেখে আসছে আত্মীয়-পরিজনহীন নিঃসঙ্গ লছমন এ গ্রামে ত্রিশ বছর ধরে একলাই বাস করে এসেছে। গ্রামের এক প্রান্তে বহুকাল থেকে কয়েক বিঘে বিস্তৃত অনাবাদী ডাঙা জমি পড়ে ছিল। অজস্র বুনো লতাগুল্মের জঙ্গলের মাঝে মাঝে পরিষ্কার সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত সুন্দর জায়গা। রাখাল ছেলেরা বাঁশি হাতে এখানেই গরু চরাতে এসে থাকে। অনেকগুলো আকাশ-চুম্বী দেবদারুগাছ নীল আশমানের সাথে এই সবুজ জমিটুকুর একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে গোটা জায়গাটার সৌন্দর্য যেন আরো গাঢ় করে তুলেছে। এদিকে ওদিকে আম-কাঁঠালের গাছও দু'একটা করে ছড়িয়ে আছে। গরু-বাছুরের গলার টুং টাং ঘণ্টার শব্দ আর মাঝে মাঝে হাম্বা রব, রাখাল ছেলেদের বাঁশি আর থেকে থেকে তাড়াহুড়োর হৈ চৈ ও পাখির কিচির মিচির আওয়াজ ছাড়া জায়গাটিকে মোটামুটি নিরিবিলিই বলা চলে। এরই মাঝে আপন হাতে বাঁধা একখানি ঘর, সামনে খোলা আকাশের নিচে বসবার জন্য বাঁশের একটা মাচা আর একটি কুয়ো, এই নিয়ে লছমনের ডেরা। এই গ্রামে যখন প্রথম আসে, লছমন্ তখন পুরো বছর চল্লিশের এক জোয়ান। বেশ পোক্ত লোক। যখন যে কাজে লাগাও, পিছু পা হবার মানুষ নয়। শক্তিধর বলে অল্পদিনের মধ্যেই গাঁয়ের একটি সম্পদ হিসেবে সে গণ্য

হয়ে গেল। তবে সাধারণত কাঠ কাটা, ঘর ছাওয়া, বেড়া বাঁধা, কখনো সখনো মাটি কেটে বয়ে দিয়ে আসা, এগুলি করেই তার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়ে যেত। যেদিন যার বাড়িতে খাটত, সেদিন তার ওখানেই সে খেত। মুসলমান বাড়ি বলে তার কোনও আপত্তি নেই। শুধু গরুটা মুরগিটা তার খাওয়া চলত না। যেদিন কোথাও কাজ না করত, নিজ ঘরেই শাক রুটি সে পাকিয়ে নিত। গাঁয়ের ছেলে-পিলেরাও কোনো কোনো দিন আচার সহযোগে সেই রুটির অংশ গ্রহণ করত। সেকালের মুরুব্বিরা এতে কেউ কখনও আপত্তি করেননি। তবে তাঁরা নিজেরা কখনো এভাবে খাননি। অবশ্য গত ত্রিশ বছরে এক এক সময় এক এক রকম ঢেউ উঠেছে। মাঝে এক সময়ে কোনও কোনও দেওয়ানি মাতব্বর লোক এরকম খাওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছিল, তবে ছেলেরা তা গায়ে মাখেনি। মোটামুটিভাবে এটা চল হয়ে গিয়েছিল। লছমনের একটা সারেঙ্গি ছিল। মর্জি হলে, সন্ধ্যার পরে আপন ডেরার মাচায় বসে কখনও বা ক্যাঁ কোঁ করে সেটা সে বাজাতো। কোনো কোনো দিন ছেলেরাও সেখানে গিয়ে আসর জমাত। এ নিয়েও মাঝে একবার আশপাশের গ্রামের দু'একজন দেওয়ানি প্রশ্ন তুলেছিল, গ্রামে এসব বাদ্যি বাজনা বরদাস্ত করা হাদিস দোরস্ত কি না। কিন্তু সে সমস্ত কথাও ছেলেপিলেরা কেউ কানে তোলেনি। একটা ব্যাপার আপাতচক্ষে যতই খাপছাড়া ঠেকুক না কেন শুরুতে, অবস্থা গতিকে দীর্ঘদিন সেটা চালু থাকলে যেমন তা বাদ-

বিসম্বাদের উর্ধ্বে চলে যায়. আপন ভালমন্দ যা কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে গত ত্রিশ বছরে লছমন্‌প্রসঙ্গও ঠিক তেমনি করে একান্ত ভাবে মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামে সেরকম একটা স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল।

একা একা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে শুধু লছমনেরই নানা কথা আজিজের মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে তোলপাড় করছিল। দেশ বিভাগের পরে হিন্দুস্তান পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় কেউ কেউ মনে করেছিল, এইবার বুঝি লছমন্‌টা দেশে চলে যাবে চিরদিনের জন্যে। ইসলে সওয়াবের মজলিশে এসে পাশের গাঁয়ের বছির নাড়িয়া অন্যভাবে কথাটা একবার তুলেও ছিল। বছির নাড়িয়ার মাথায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানা সুবিস্তৃত টাক্, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। আরো দু'তিন জন ভারী বয়সের বছির থাকায়, ন্যাড়া মাথা অর্থে স্বাতন্ত্র্য-মূলক নাড়িয়া শব্দটি তার নামের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। জিয়াফতের রান্নার জন্য বিরাট একবোঝা খড়ি ফেড়ে নিয়ে এসে যখন লছমন ঝপাৎ করে সেটা ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন বাঁ হাতের তালু দিয়ে আপন মাথার টাকখানায় হাত বুলোতে বুলোতে একটুখানি মুচ্‌কি হাসির সাথে বছির নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—কি লছমন ভাই! দেশ তো দুইডা হইল, এ্যালাও এইঠে থাকিবেন, না কি চম্পট দিবেন বাহে?.........প্রশ্নটার জন্য লছমন ঠিক প্রস্তুত ছিল না। মাথার বেঁড়ে পাকানো গামছাটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে নিজের গা ঝাড়তে ঝাড়তে তবু সে জবাব দিয়েছিল—আরে বাহে দেওয়ানি,

হামি কোনওঠে যাইবে না। হিন্দু মুসলমান অংরেজ মিলিয়ে দেশ একটা বানাইয়ে ছিল, ফের উয়োহি অংরেজ মুসলমান হিন্দু হি মিলিয়ে একটা ভাঙিয়ে দেশ দুইটা বানাইলে! হামি তার কি জানবে? না তো, সন্‌সারের মধ্যে এমোন বহুৎ দেশ আছে........হাতের আঙুলে এক দুই তিন করে গুণে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বলেছিল—এই দেখো, বাংলা জোবান্ একটা তোমার দেশ আছে। একটা ফের ছাতুখোর হামার আছে। হামার একটা মাহ্‌রাঠী দোস্ত ছিল, ওর ফের ঔর একটা দেশ। আরে ভাইয়া, ঝুট্ বাত নহি আছে, বোর্‌খা তো ঔর দূর, ঔরৎ সেখানে ধোতি পীন্‌হে!........হাত নেড়ে সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করে এমন ভাবে হো হো শব্দে সে হেসে উঠল যে আজিজের বেশ মনে আছে চারিদিকে হাসির একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। বছির নাড়িয়াও তার নিজ প্রশ্নের প্রকৃতি বা গুরুত্ব যুতসইভাবে উপস্থিত করবার সুযোগ আর নেই বুঝে, বৃথা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা আর না করে, সকলের সাথে হেসে উঠে ফের হাতের তালু দিয়ে আপন টাকখানা বুলোতে বুলোতে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

আসলে, দেশবিভাগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে লছমন যে খুব বেশি মাথা ঘামাত তা নয়। ইংরেজকে যে শেষ পর্যন্ত পালাতে হয়েছে, এতেই সে খুব খুশি। তবে, তার নির্বিকার মনোভাবের একটা কারণ ছিল এই যে, সে খুব নিশ্চিন্ত ভাবেই বুঝেছিল যে হিন্দুস্তান পাকিস্তান

হওয়ায়, আর যাই হোক, তার নিজস্ব অবস্থানের বিশেষ কিছুই ভালমন্দ পরিবর্তন হয়নি। শুধু, বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় উড়ো উড়ো ভাবে যখন একটা কথা তার কানে এসেছিল যে, ইস্কুল কলেজের লেড়কারা নাকি দাবি তুলেছে যে পূর্ববঙ্গে যারা থাকবে এমন সববাইকেই বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতে হবে, তখন সে সামান্য একটুখানি বিচলিত হয়েছিল। অবশ্য বাঙালীর সাথে পরিচয় তার দীর্ঘ দিনের। সুতরাং, হঠাৎ সাড়ে চার কোটি বাঙালী একেবারে ক্ষেপে গিয়ে তার মত একজন বুড়ো মানুষকেও ধরে জবরদস্তি বেত-সহযোগে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রথম ভাগ পড়াতে শুরু করবে, এমন হাস্যকর একটা কল্পনায় সে বিশ্বাস করত না। তবু সে মনে করেছিল, ইস্কুল কলেজের লেড়কারা সত্যি কি বলছে না বলছে, তা ভাল করে জানাটাও উচিত। তাই, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গুলি চালনার প্রতিবাদে রাজার হাটে যে জনসভা হয়েছিল, কয়েক মাইল হাঁটবার পরিশ্রম স্বীকার করেও লছমন বক্তৃতা শুনবার জন্যে সেখানে গিয়েছিল। এবং ফিরে এসে পরম প্রীত হয়ে বলেছিল—এ তো হক্ আছে। তুমার যেমন হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবী বুলি, হামার তেমন বাংলা বুলি। যেমন আছে পানি, হাওয়া, তেমন আছে আপ্‌না জোবান, মুখের বুলিটা। সেটা নেই মানবে কেনো? অংরেজের মত লাঠি গুলি চালাবে, তব্ অংরেজের মতই বাদশাহীর খতম! লেড়কাদের বাত সহি আছে। জবরদস্তি যে করবে, ভগোয়ান তার ভাল করবে নাই।

লছমনের সেই মন্তব্যটা আজও পরিষ্কার মনে আছে আজিজের।

লছমন এমনিতে খুবই রামভক্ত লোক। তার ঘরে এক-খানাই মাত্র ছবি ছিল। সেটা ফ্রেমে বাঁধানো রাম-সীতার ছবি। আজিজ বহুবার ছবিখানা ভাল করে নজর দিয়ে দেখেছে। কোনও আড়ম্বরপূর্ণ ছবি নয় সেটা। বাঙালী কোনও এক শিল্পীরই আঁকা। সম্ভবত মাসিক প্রবাসীর পাতা থেকে সন্তর্পণে কেটে নিয়ে বাঁধানো। বনের মধ্যে গাছ-তলায় একখণ্ড শিলার উপরে, বাইশ তেইশ বছরের তরুণ, মাথার চুল শিখদের মত খোঁপা করে বাঁধা রাম খালি গায়ে বসে আছে। বছর ষোল সতেরো বছরের কিশোরী সীতা রামের কোলে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন গভীর এ ঘুম তা বোঝা যায়। খোঁপা শিথিল হয়ে চুল-গুলো তার এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে। বেশবাসের সতর্কতাও খুব যে অটুট রয়েছে তা নয়। কিন্তু অদ্ভুত এক কুশলতার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে দিয়ে তার শুচিতা পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। গভীর মমতা আর সহানুভূতি মাখা চোখে রাম সীতার দিকে চেয়ে রয়েছে। ছবিখানা বাস্তবিকই সূক্ষ্ম রসবোধে আপ্লুত সার্থক একখানা ছবি। ওটার দিকে তাকিয়ে আজিজ একদিন লছমনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা বাহে, এই রামটাকে এত পছন্দ কেন তোমার?

—হামার পসন্দ্ হইবে তো! উ তো হামার দুশমন্ নহি আছে······তার স্বভাব সুলভ রসিকতা মিশিয়ে লছমন্ বললে—

তোরা চার চারটা বিবি একসাথে রাখবি, রাম তো তুমার বড় দুশমন হোবেই।

—এই জন্যে হ'?……আজিজ হেসে উঠল।

—রাম তো আদমি……বক্তৃতার ঢঙ্এ প্রশ্ন করল লছমন্ —লেকিন সেরা দেওতা উ কেনো আছে?

মুহূর্তের জন্য একবার থেমে, ছবিখানার দিকে তাকিয়ে হাতখানা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে সীতাকে দেখাতে দেখাতে লছমন্ নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিল—ওর দিলের মধ্যে শুধু একটা ঔরৎ……তার গলার স্বরে কোমল অথচ প্রত্যক্ষ একটা অনুভূতি যেন ফুটে উঠল। আজিজ একটু বিস্ময় বোধ করল তাতে।

কথার জের টেনে লছমন্ বলে চলল—কেতাব পুরাণের মধ্যে তো কত রাজা মহারাজার নাম, লেকিন ঔরতের বেপারে কোই খাঁটি নহি আছে। একটা এই রাম…… পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বেতের মোড়াটার উপরে দেবে বসল লছমন্।

রাম চরিত্রের ব্যাখ্যা শুনে উৎসুকভাবে আজিজ লছমনের মুখের দিকে তাকাল।

—সাচ্ বাত্! তর্ক করবার ভঙ্গীতে লছমন বললো—হাঁ, তবে একটা কথা হইতে পারে। বাপ দশ্রথের ছিল তিন বিবি। তাই জন্য বাপের জিন্দগী কেমন বরবাদ হইয়ে গেল। ই সব দেখে শুনে উ দুস্রা রাস্তা ধরে লিলো। বাহাস্ হইতে পারে, ই তো সিফ আক্কেলের কথা আছে। এর মধ্যে দেওতা ফেওতা কছু নেই। সহিবাত! লেকিন আসলি চীজ তো ওহি আক্কেল।

আজিজ এইবার একটু তর্কের উৎসাহে মজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এতই যদি আক্কেল রামের, তো ফের বেকসুর সীতাক্ বনবাস দিলে ক্যান ?

প্রশ্নটায় লছমন্ একটু বিমর্ষ হয়ে দমে গেল। তারপরে ধীরে ধীরে একটু কোমল ভাবে নরম স্বরে বললে—ভাইরে, এর মধ্যে খারাব আদমির হাত আছে।······এবারেও তার গলার স্বরে সেই অদ্ভুত প্রত্যক্ষ অনুভূতিরই প্রকাশ।

—কি রকম ?

—তা না হইলে, লছমন্ মাহাতোর জিন্দ্‌গী এমন বরবাদ হইয়ে যায় ?....ইতস্তত করতে করতেও লছমন্ সেদিন সামলাতে পারলো না। বলে ফেললে—হামার রুক্‌মনিয়ার খিলাফ্ বদমাশ আদমি বহুৎ কুছ খারাব বললে। হামি এক কাত্‌রা ভি বিসোয়াস্ করি নাই। লেকিন্ দিমাগ্‌টা কুছ বিগ্‌ড়াইয়ে গেল। রুকমনিয়াকে পুছ করলাম না। বিসোয়াস্ করি নাই, কা পুছ করবো হো ?······লছমনের কপালে একটা ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। পরক্ষণেই শান্ত গলায় বললে—বহুৎ গালিগালাজ করলাম। উ ভি হামার দিল্‌টা বুঝলে না। লাজে শরমে পানিতে ডুবে রাতে মরে গেল।

লছমনের চোখ দুটো একটু সজল হয়ে উঠল বলে মনে হল আজিজের। প্রসঙ্গটা কি করে বদলানো যায় আজিজ সেই কথাই ভাবছিল। লছমন নিজেই, খইনি ডলবার জন্য ট্যাঁক থেকে চুনার ছোট্ট কৌটাটা বের করতে করতে একটুখানি স্মিত হাস্যে প্রসঙ্গটা শেষ করে দিয়ে বলল—লেকিন লছমন

মাহাতোর দিলের মধ্যে একটাই ঔরৎ আছে। সো' উহ রুকমনিয়া……এবারেও তার হাতখানা ধীরে ধীরে উঠে, বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই, অঙ্গুলি নির্দেশ করল সেই একই ছবির দিকে।

কলেজের সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন, আনোয়ার কাহিনীটা আজিজের কাছ থেকে শুনে প্রশ্ন তুলেছিল—তা হ'লে বলতে চাও, বিয়ে-সাদীর পিড়াপিড়ি থেকে রেহাই পাবার জন্যই তোমাদের লছমন ভাই নিজ সমাজ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করে তোমাদের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে?

—এমনও তো হতে পারে, পাছে কোনও ঔরতের আশেক মুহব্বতের ডোরে বন্দী হয়ে যান, এই ভয়ে তোমাদের মহাবীর রামানুজ যবনকুলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করছেন?

কথাটা বলেছিল অপর এক বন্ধু আখ্‌তার। আনোয়ার সমস্ত আলোচনাটিকে আর একটু রসায়িত করে বললে—তা যবনকুলে কি আর ঔরৎ নেই? রসিক মাত্রেই জানেন, প্রেমেতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

—নউজুবিল্লাহ্‌!…মাটিতে থুথু ফেলে আজিজ বলেছিল— মানুষটাকে জানলে কখনই তার সম্পর্কে তোরা এমন সব কথা বলতিস্‌ না।

লছমন যে মৃতদার একথা সবাই জানলেও কাহিনীটা খুব বেশি লোকে জানত না। তার রাম ভক্তির উল্লেখ করে যদি কেউ এমনি বলত—লছমন ভাই, তোমার নামটা বাহে সার্থক রাখা হইছে!

প্রত্যুত্তরে সে শুধু একটু বিনীত হাসি হাসত মাত্র।

বেলা বেশ বেড়ে গিয়েছে।

অবশ্য, হাঁটতে হাঁটতে আজিজও নিজের গ্রামের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল। সামনেই শুকনো নদী। সেটা পার হলেই গ্রামের উত্তর সীমানা আরম্ভ হবে। এদিকে আকাশ পাতাল বহু কিছুই তো আজিজ ভেবে ফেলেছে, কিন্তু লাশ দাফন কাফনের ব্যবস্থাটা যে কি করা হবে, ভাবতে ভাবতে যেই সেই জায়গাটায় যাচ্ছে অমনি সমস্ত বুদ্ধিটা তার যেন ফস্‌কা গেরোর মতই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এলাকাটা চিরকালই এই রকম। আশেপাশে বিশ পঁচিশটা গ্রামে হিন্দুর বসবাস কোনও দিনই নেই। একমাত্র রাজার হাটে পাঁচ সাত ঘর কাঁসারি ছিল। তা, রাঙ্‌ঝাল পেতলের অভাবে কিছুদিন থেকে এমনিতেই তাদের ব্যবসা উঠে যাচ্ছিল, পাসপোর্ট প্রথা চালু হবার পর সে কয়েক ঘরও চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আজিজ বুঝে উঠতে পারছিল না কিছুতেই, উপস্থিত বিপদটা থেকে কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

পাড়ার মধ্যে ঢুকতেই বাঁ-হাতে ছোট একটা টিনের ঘর। গ্রামের লাইব্রেরী সেটা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আট দশটি ছেলে উচ্চস্বরে প্রচণ্ড তর্ক করছিল। সামান্য বয়সের পার্থক্যে এরা কেউ কিশোর, কেউ তরুণ, কেউ বা যুবক। কাছাকাছি যেতেই, হাঁউ মাউ করে চারিদিক থেকে আজিজকে ছেঁকে ধরল ওরা—এত দেরি করলেন বাহে, তোঁরা! এতি তো এক জবর হাঙ্গামা।

ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন, লাইব্রেরীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট আবু বক্কর তার উগ্র তারুণ্যের জন্যে নিন্দিত বলে, নিজ কথা-বার্তায় নাকি সাধ্যমত বিনয়ী হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। সেই আবু বক্করের কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে উঁচুতে শোনা যাচ্ছিল—মুই কথা কইলেই তো ফের দোষ হয়। তিরিশ বছর ধরি মানুষটা সমাজের যে খেদমত করছে, হেঁতু বুলি সিডা তো তোমার কাছে তিতা লাগে নাই। সিডা তো কাঁয়ও নাপাক্ কয় নাই। এ্যালা, মানুষটা মারা গেইছে বুলি, তাকে চোঁওয়া না-জায়েজ হইবে? মানুষটা তা হইলে জানোয়ারের মত পচি যাইবে? ইডা ফের কোন ইনসানের কথা!

—তুই থাম বক্কর!···এক ধমকে আবু বক্করকে থামিয়ে, ব্যাপারটা আজিজকে খুলে বলবার জন্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লুৎফর এগিয়ে এল। এই লাশ স্পর্শ করা না-জায়েজ, একথাটা এক বছির নাড়িয়া ছাড়া আর কেউ বলেনি। আর বছির নাড়িয়ার এই ষোল আনাই নেতিবাচক বিধানটি কেউ গ্রহণ-যোগ্য বলেও মনে করছে না। সুতরাং তা নিয়ে হৈচৈ করবার দরকারটা কি? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কি করাটা উচিত হবে? আবু বক্কর বলছে যে লছমন্ ভাই আমাদের সকলের প্রিয়জন ছিল। যথোপযুক্তভাবে তার মৃতদেহের সৎকার করা আমাদের একটা অবশ্য করণীয়। সে ছিল হিন্দু এবং তার ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো আমাদের অবশ্যই উচিত। সুতরাং মৃতদেহ দাহ করতে হবে। অল্প বয়স্কদের কাছে আবু বককরের যুক্তিটা বেশ অকাট্য বলে মনে হচ্ছিল। তবু তার পরামর্শটা ওদের কারোই

ঠিক পছন্দসই হচ্ছিল না। খুব সম্ভব সংস্কারে বাধছিল। কিন্তু আবু বক্করের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসের সাথে কোনও যুক্তি খাড়া করতে না পেরে শুধুই গাঁই গুঁই করছিল তারা। নিজ প্রস্তাবের সপক্ষে আবু বক্কর দৃঢ়মুষ্টিতে আরও কি একটা যেন যুক্তি উত্থাপন করতে যাচ্ছিল। হাতের সাইকেলটা একজনকে ধরতে দিয়ে, গরম লাগছিল বলে সার্টের বোতামগুলো খুলতে খুলতে আবু বক্করের দিকে চেয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় আজিজ বললে—শুধু আগুনে পোড়ালেই কি হেঁদুর বিধিমত সৎকার হইবে? ওমার মন্তর তন্তর কি হামার জানা আছে হ'?

আজিজের প্রশ্নে আবু বক্করের উৎসাহ উদ্দীপনা বুদ্ধি বিক্রম সমস্ত যেন এক নিমেষে ঝট্ করে দমে গেল। হঠাৎ বাড়তি একটা যুক্তির আশ্রয় পেয়ে ওর বিরোধীরা এবার উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল। ফুটবল টিমের ক্যাপটেন পদটির জন্যে হামিদ আর আবু বক্করের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটা পুরানো রোগের মতই দুরারোগ্য। সেই হামিদ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল—মুইও তো সেই কথা কই! মন্তর তন্তর বলা কওয়া নাই, খামোখা পোড়াইলেই কি ওমার রুহের শান্তি হইবে?

হামিদকে থামিয়ে দিয়ে, এবারে লুৎফর এই পক্ষের যুক্তিটা খোলসা করে ব্যাখ্যা করল। গ্রামের বেশির ভাগ ছেলেদের মত হচ্ছে এই যে লছমন ভাই হিন্দুই হোক আর যাই হোক সে আমাদের একান্ত আপনার জন ছিল। সুতরাং, একান্ত আপনার জনের বেলায় আমরা যা যা করে থাকি, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ বেলাতেও আমরা ঠিক তাই তাই করবো।

জানাজা হবে, দাফন করা হবে, দস্তুরমত যথাসময়ে ফতেহা করা হবে। সব, সব! এর মধ্যে কোনও কিন্তু টিন্তু নেই। গ্রামের মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে যাঁদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেপিলেরা ঐ লতাগুল্মে ঘেরা ডাঙাটায় গরু চরাতে যায়, তাঁরা এই মতটিকেই সমর্থন করছেন। তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। সে কারণ হচ্ছে, তাঁরা মনে করেন যে, যে শাস্ত্র অনুযায়ীই হোক না কেন, মৃতদেহের সৎকারটা একটা বিধিমতই হওয়া উচিত। তা না হলে, আত্মার শান্তি না হওয়ায়, লছমনের মত একটা সৎমানুষের যেমন একদিকে অনাবশ্যক পারলৌকিক ক্লেশ হবে, অপরদিকে ছোট ছোট ছেলেপিলেরাও ডাঙায় গরু চরাতে গিয়ে সে প্রেতাত্মার সম্ভাব্য কার্যকলাপ থেকে ভয় ডর পেতে পারে। কিন্তু সে যা হোক প্রকৃত বাধাটা আসছে অন্য দিক থেকে। দেওয়ানী মাতব্বরদের কেউ কেউ একেবারে বেঁকে বসেছে, সেটা হয় না। মুমিন মুসলমান ছাড়া কারো জানাজা হতে পারে না বা সে জানাজায় শরীক হওয়াও চলতে পারে না।

—এমাদ হাজী সাহেবের কাছে বুলে মানুষ গেইছে? তাঁই কি ফিরছে?…আজিজ প্রশ্ন করল।

—ফিরছে। হাজী সাহেবের নাগাল পাওয়া যায়নি…বললে লুৎফর—হাজী সাহেব মুরিদ বাড়ি সফরে বাহির হইছেন।

জ্যেঠা কুতি?…আজিজ ফের জিজ্ঞাসা করলে। জ্যেঠা অর্থাৎ কি না খয়ের মুন্সী। তিনি গ্রামের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের বহু পুরানো প্রধান শিক্ষক। আজিজের তিনি আপন জ্যেঠা হন।

—তাঁই লছমন ভাইয়ের উতি গেইছে........একজন জবাব দিল—আমীর মামু, রহমান চা', মুরুব্বিরা সবাই উতি।

পাড়াটার দক্ষিণ প্রান্তে, রাস্তার ধারেই হচ্ছে মসজিদ। মসজিদ ছাড়ালেই বিঘে দু'তিন চাষের জমি। জমিটা যেখানে শেষ হল, সেখান থেকেই লতা গুল্মে ঘেরা গরু চরানো ডাঙাটার আরম্ভ। কিছুটা ভিতরে ঢুকলেই লছমন ভাইয়ের ডেরা পাওয়া যাবে। আজিজ তার দলবল সমেত মসজিদটার কাছাকাছি গিয়েছে এমন সময়ে এক সারি মহিলা ঐ ডাঙার ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লেন। এঁরা সবাই কেউ লছমনের নানী, কেউ দাদী, কেউ খালা, বু, ভাবী, শেষবারের মত লছমনকে দেখে আসতে গিয়েছিলেন। দুই দল মুখোমুখি হতেই একজন প্রৌঢ়া মহিলা সারি থেকে বের হয়ে এসে আজিজকে থামালেন। প্রৌঢ়া আমীরের স্ত্রী, সম্পর্কে আজিজের তিনি নানী। আজিজ জিজ্ঞাসুভাবে নানার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠে টল্ টল্ করছে। অতি কষ্টে তিনি বললেন—বাপো, কি করা ঠিক হয়, সেটা তোঁরা করেন। কিন্তু মানুষটার যেন কোনও অসম্মান না হয়।

আজিজও ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিল।

একটা দেবদারু গাছ ঠেস দিয়ে, খয়ের মুন্সী অত্যন্ত বিমর্ষ বদনে বসেছিলেন। ফর্সা রং, পাকা চুল, স্বল্প পরিসর পাকা দাড়ি। খয়ের মুন্সীর বয়সও প্রায় বছর সত্তর হবে। প্রথমা

স্ত্রী মারা যাবার পর তিনিও দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। সৎ ও চরিত্রবান খয়ের মুন্সী নিজে একটু দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। লছমনের ভেতরকার দার্শনিক মানুষ আবিষ্কার করে পেতে তাই তাঁর খুব বেশি দেরি হয়নি। বয়স এবং জীবন-বোধের নৈকট্য এদের দুজনের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। তাই লছমনের মৃত্যুতে একান্তভাবে তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন। তাতে আবার তার শেষকৃত্য সম্পর্কে এত তর্ক বিতর্ক ও মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় গভীর বেদনা বোধ করছিলেন তিনি। মৃতের অসম্মান করা হচ্ছে ধারণায় নিজেকে তাঁর অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। তবু, এ বিষয়ে কি করা কর্তব্য মনে মনে সেটা মোটামুটি স্থির করা সত্ত্বেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিতে ঐ পদক্ষেপের সমীচীনতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্যই তিনি একটু সময় নিচ্ছিলেন। এরকম একটা ঘটনার আশঙ্কা যে তিনি একেবারেই করেননি, তা নয়। সেজন্য লছমনের অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি হয়, তখন, খুব সতর্কতার সাথে, যাতে সে কোনও রকম আঘাত না পায়, সেই রকম দেখে শুনে, একান্ত বন্ধুভাবে, লছমনকে তিনি সমস্যাটা একবার খুলে বলেছিলেন এবং অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করবার জন্য একবার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। লছমন মৃদু রসিকতা মিশিয়ে হেসে হেসেই ভাঙা গলায় বলেছিল—ধরম্ লিয়ে তো কভি মাথা ঘামাইনি দেওয়ানি, জিন্দগী ভর করম লিয়েই মাথা ঘামাইছি। অব, দিন ফুরাইলো, ধরম দিয়ে আর কি হোবে? এখন ভগোয়ান যা কোরবে···

দ্বিতীয়বার দেখা করে খয়ের মুন্সী কাকুতি মিনতি করে ফের অনুরোধ করায় অবশেষে লছমন বলেছিল—ফজরে আসিও। সোচ্ বিচার করিয়ে দেখা যাইবে।

কিন্তু ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসুৎ বাস্তবিকই লছমনের আর মেলেনি। রাতেই কোনও এক সময়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সে।

একই প্রশ্নে, বিভিন্ন মওলবি মওলানার সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ফতোয়ার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ জীবনে খয়ের মুন্সীর এতবার হয়েছে যে ওর উপরে তাঁর আস্থা আর অক্ষুণ্ন নেই। তবুও এমাদ হাজী সাহেবের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন তিনি নেহাৎ সামাজিক কর্তব্য বোধে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তিনি ভয় করছিলেন যে সেই শাস্ত্রীয় নির্দেশের সাথে তাঁর নিজ বিবেক বুদ্ধির যদি সংঘর্ষ ঘটে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন? যাই হোক, এমাদ হাজী সাহেবের সাক্ষাৎ না পাওয়ায়, তিনি অনেকখানি হালকা বোধ করলেন নিজেকে। অবশ্য, গ্রামের মুরুব্বি দেওয়ানিদের প্রায় সকলের সাথেই তিনি কিছু কিছু আলাপ করেছিলেন এবং আকারে ইঙ্গিতে নিজ মনোভাবের আভাষও দিয়ে রেখেছিলেন কিছুটা। কিন্তু কোনও পরিষ্কার সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করেননি। তিনি শুধু অপেক্ষা করছিলেন আবদুল আজিজের জন্য। আজিজ এসে পৌঁছুতেই, তার সাথে পরামর্শ করে, গ্রামের দেওয়ানি মুরুব্বি ছেলে ছোকরা সবাইকে নিয়ে সেই মাঠেই মিটিং বসালেন।

সমস্ত ঘটনাবলী অনুধাবন করে মর্মপীড়া অনুভব করছিল

আবদুল আজিজ। মানুষ মানুষের প্রতি একটা অতি মামুলি কর্তব্য সম্পাদন করবে, তাতেও পদে পদে এত দ্বিধা, এত দোদুল্যমানতা কেন? এ কি শোভনীয়? তবুও আজিজ বুঝেছিল, ধৈর্যশীল হওয়া ছাড়া পথ নেই। যে কূপমণ্ডুকতার মধ্যে মানুষ নিক্ষিপ্ত তাতে নিজেদের ধারণার সাথে নিজেদের বুদ্ধির কঠিন বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা চিন্তাধারায় উপনীত হওয়ার পথে এ হচ্ছে এক অনিবার্য স্তর।

—আল্লাহ্ মাঝে মাঝে পরখ করে দেখে থাকেন যে তাঁর মখলুকত্ তিনি ঠিকমতই সৃষ্টি করেছেন কি না।···বৃদ্ধ খয়ের মুন্সীর গলায় কেঁপে কেঁপে উঠল শিক্ষকসুলভ সাহিত্যিক ভাষায় এক গভীর আবেদন—আজ তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন আমাদের তিনি ইনসান করে তৈরি করেছেন কি না। আজ আমাদের মনুষ্যত্ববোধের এক মহাপরীক্ষা।

খুব ধীরে ধীরে, অল্প কথায়, খয়ের মুন্সী বলে গেলেন কাহিনীর পরে কাহিনী, যার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠল, কাজে কথায় রসে রঙ্গে ভঙ্গিতে সেই চির পরিচিত মানুষ লছমন, মহৎ উদার, মানুষের প্রতি কানায় কানায় ভরা ভালবাসা নিয়ে সেই একান্ত আপনার জন। বলতে বলতে, তিনি প্রশ্ন করে বসলেন: আজ তার প্রতি আমাদের এই হৃদয়হীনতা কি শুধুই প্রমাণ করবে না যে গত তিরিশ বছর ধরে তার সাথে আমরা মোনা-ফেকি করে এসেছি? শুনতে শুনতে সকলের মনে হল যেন লছমনই তাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ম্লান একটা স্মিত হাসি মুখে নিয়ে রসিকতার ছলে কৈফিয়ৎ চেয়ে বসল—

বাহে, আপন আপন কলিজার মধ্যে হাত সিধাইয়ে তাল্লাশ করিয়ে দেখো ত' কোথায় কছু ইনসানিয়ৎ মালুম হয় কিনা !···

সকলের মাথা যেন হেঁট হয়ে এল।

আজিজ এবার উঠে দাঁড়িয়ে খুব পরিষ্কার করে তার প্রস্তাবটি পেশ করল। যে দু' একজনের মনে তবুও এক আধ-টুকু খুঁতখুঁতি ছিল, বিকল্প কোনও প্রস্তাব না থাকায় তারাও চুপ মেরে গেল। বেশ সন্তুষ্ট ও বিপুল সমর্থনের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ে গেল। ঠিক হল, কোনও ধর্মাচরণের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। ফুল লতাপাতা দিয়ে, আতর গোলাপজল দিয়ে মৃতদেহকে ভূষিত ও সুবাসিত করা হবে। সকলে গোসল করে- পাক সাফ মনে গভীর নিষ্ঠার সাথে সেই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গিয়ে সসম্মানে তাকে দাফন করা হবে।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা সুন্দর জায়গা দেখে তার সমাধির স্থান নির্ণয় হয়ে গেল। অনেকেই তৃপ্ত হল, এমনি করেই বুঝি তারা প্রিয় লছমন ভাইকে তাদের গ্রামের মাটিতে চির দিনের জন্য নিবিড়ভাবে একাত্ম করে নিতে পারছে।

জঙ্গলটায় আজ গ্রামের লোক যেন ভেঙে পড়েছে। অভ্যাস ও সংস্কার বশে সকলেরই মাথায় সাদা কিস্তি টুপি। কারো মুখে কোনও কথা নেই। দূরে একটা ঘুঘু ডাকছিল। অদ্ভুত বিষণ্ণ লাগল সে ডাক সকলের কানে। আম কাঁঠালের সদ্য প্রস্ফুটিত মুকুলের সুবাস, আকাশ, বাতাস, মাটি ঝাড় জঙ্গল ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক, সমস্ত কিছু মিলে মিশে একাকার

হয়ে গিয়ে একটিই মাত্র অখণ্ড সত্তা জাগিয়ে তুলেছে। আর যেন সবই হারিয়ে গেছে। আর ঐ অতল হারিয়ে যাওয়ার মাঝখানে, শুধু একটি হাহাকার ভরা প্রশ্ন প্রত্যেকের হৃদয়ের দুয়ারে দুয়ারে যেন বৃথাই মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে। সে প্রশ্ন হচ্ছে অনন্ত স্রোতের মত প্রবহমান এই সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে, উত্তরটা যার চিরদিন মিলতে মিলতেও অল্পের জন্য মিলছে না।

কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে মৃতদেহকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। বড় বড় কলার পাতা দিয়ে ফের সেটাকে ঢেকে দেওয়া হল। খয়ের মুন্সী নিজেই সমস্তটা পরিচালনা করছিলেন। তিনি কবরের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এক মুঠো মাটি তুলে নিলেন। সকলেই এগিয়ে এসে মাটি তুলে নিল হাতের মুঠোয়। আবৃত মৃতদেহটির দিকে শেষবারের মত চেয়ে দেখতে গিয়ে, অপূর্ব বৈরাগ্যে ধর্মভীরু খয়ের মুন্সীর মনে গুন্‌গুন্ করে ধ্বনিত হয়ে উঠল গভীর দার্শনিকতায় সিক্ত আল্লাহ্‌'র সেই বাণী ঃ

এই মাটি হইতেই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি।

এই মাটিতেই তোমাকে বিলীন করিয়া যাইতেছি।

দীর্ঘ সত্তর বৎসরের জীবনে বহু প্রিয়জনকে কবর দিতে দিতে অভ্যস্ত খয়ের মুন্সী এক মুঠো দুমুঠো করে মাটি কবরে ফেলতে ফেলতে, সম্মোহিতের মত শান্তস্বরে কেমন করে যেন সেই বাণীই উচ্চারণ করে ফেল্লেন ঃ

মীন্ হা খালাকানা কুম্

ফী হা নইদো কুম্

কথাগুলো ছন্দোময় কবিতার মত ঝঙ্কারিত হয়ে সকলের কানে কানে বেজে উঠল। প্রায় সকলেই বিস্ময়ে একে অপরের মুখের দিকে চাইল। নিজের গলার স্বর নিজের কানে ঢুকতেই গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা মনে পড়ায়, চমকে উঠে খয়ের মুন্সী সকলের দিকে চাইলেন। মুহূর্তের জন্য একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। ঠিক পরক্ষণেই হঠাৎ স্থির হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন :

মৃত্যু যেমন মানুষে মানুষে একাকার করে একই সত্তায় বিলীন করে দেয়, জীবনও যেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সকলকে অভিন্ন হৃদয় করে তুলতে পারে। হে আল্লাহ সে রকম জীবন দাও!

অন্তরের এক গভীর অনুভূতির প্রকাশ বেদনায় সময়োচিত কিছু একটা বলবার তীব্র কামনার তাগিদ বোধে, সকলেরই মনটা যেন ছট্‌ফট্ করছিল। ঐ কথাগুলো তাই সকলেরই কানে বড় ভাল লাগল। তারাও মুখর হয়ে উঠে আস্তে আস্তে কথাগুলো আবৃত্তি করল। অপূর্ব আবেগময় কাঁপা কাঁপা কণ্ঠের গুরুগম্ভীর ছন্দের একটা তরঙ্গ ঝঙ্কার, সবুজ পালকের মত পাতায় পাতায় ঢাকা দেবদারু গাছের সিঁড়ি বয়ে বয়ে উঠে যেন চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল উপরের নীল আকাশখানায়।

দিনটা বেশ বড়। বেলা তখনও ডোবেনি। সমস্তটা দিন একটানা বৃষ্টির পরে, বিকেলের দিকে আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে রোদের আভা দেখা দেওয়ায়, সকাল হতে ঝিমিয়ে থাকা গ্রামখানা জাগা পেয়ে নাড়াচড়া করে উঠলে, দু'তিন বিঘে ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থদের বাড়ির এ গোয়াল সে গোয়াল থেকে সারাদিন আবদ্ধ গরু ভেড়া ছাগলগুলো ছাড়া পেয়ে যেমন দল বেঁধে নীরবে মাঠের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, ভোঁ বাজার সাথে সাথে কালি-ঝুলি মাখা লোকগুলো ঠিক তেমনি বিভিন্ন শেড থেকে ছাড়া পেয়ে, দল বেঁধে নীরবে আনমনে এগিয়ে চলেছিল কারখানার গেটটির দিকে। সারাদিন ধরে এরা কেউ হয়তো ইরেক্টিঙ্ শপে ইঞ্জিনের রকমারি যন্ত্রপাতিগুলো প্যাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলেছে আর ঘষা মাজা করেছে, ক্যারেজ শপে কেউ বা রেল কামরাগুলোর চাকাধুড়ি টানাটানি করেছে, কেউ কেউ ওয়াগন শপে বসে মালগাড়ির ইস্পাতের শক্ত ফ্রেমে রিভিট্ দিয়ে দিয়ে জুড়েছে ইস্পাতের বড় বড় পাত, স্মিথ শপে কেউ বা করেছে লোহা পেটাপিটি, কেউ বা হয়তো ফাউণ্ড্রি শপের গরম গালাই ঘরে বসে গলিয়েছে তাল তাল লোহা, পেতল আর তামা। সারাটা দিন ধরে ঠিক যে লোকগুলোই কারখানার বিচিত্র ধরনের মেশিনগুলোকে

তাদের বুকের উশুমে গরম করে জিইয়ে রেখেছিল, সেই লোকগুলোই এখন ফিরছে নিভে যাওয়া উনুনের মত শ্রীহীন মুখে।

ক্যারেজ শপ থেকে বের হয়ে এমদাদ আলিও এক পা দু' পা করে গেটের দিকেই এগিয়ে চলল। এমদাদ আলি সুদক্ষ ফিটার। দস্তুর মত ট্রেনিং নেওয়া লোক সে। দুই দুইবার পাইকারি হারে যে রিভারশন হয়েছে, তার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পেলে হয়তো সে এতদিনে নিজেই একজন মিস্ত্রি হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে রকমটা হয়নি। দু' দু'বার কচু কাটা হবার পরে, ফের বাড়তে বাড়তে গিয়ে সে ঠেকে আছে প্রথম শ্রেণীর সুদক্ষ কারিগরের গ্রেডে। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষও তাকে একটু ট্যারা নজরে দেখে থাকে। ভারী মেহনতের শেষে খুব পরিশ্রান্ত বোধ করছিল এমদাদ আলি। আজ দিন চারেক হল ইরেকটিঙ্ শপ থেকে ক্যারেজ শপে বদ্‌লি হয়েছে সে। ভ্যাকুয়াম সেকশনে কাজ দিয়েছে তাকে। গাড়ির তলায় শুয়ে বসে কাজ। উঁচুতে তাকিয়ে থেকে কাজ করতে করতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। পকেটের ময়লা রুমালটি বের করে ঘাড়ের কাছটায় রগড়াতে রগড়াতে গেট দিয়ে বাইরে এল এমদাদ আলি। সম্মুখেই পানের দোকানটায় দাঁড়িয়ে ছিল বোরহান্। সেও ক্যারেজ শপেই কাজ করে। পাকা চুল, এখানে সেখানে টোল খাওয়া ফর্সা ভরা ভরা মুখে সরু একটা সাদা গোঁফের নিচে পান খেয়ে খেয়ে লাল পুরু মোটা মোটা দুটি ঠোঁট, আর ঠিক তার নিচেই থুঁতনির

সাথে প্রায় মিশে যাওয়া বেশ ছিম্‌ছাম্ ভাবে ছাঁটা ছোট্ট রেশমী গুচ্ছের মত সাদা একটুখানি দাড়ি, বোরহান্ এগিয়ে এল—আস্ সালাম ওয়ালে কুম্!

—ওয়ালে কুম্ আস্‌সালাম্!…এমদাদ বুঝল যে সে তার তারজন্যই অপেক্ষা করছিল। শুকিয়ে যাওয়া গলায় একটু-খানি হাসি টেনে তাই সে জিজ্ঞাসা করল—কোয়ার্টার মিলেছে বুড়ো মিয়া?

—এত্‌না জল্‌দি!…বোরহান ঠোঁট উলটিয়ে ব্যঙ্গ করে একটু ম্লান হেসে নিজের পকেটে হাত দিল। পরক্ষণেই একখানা কাগজ বের করে এমদাদের সম্মুখে সেটা ধরে ভাঙা ভাঙা বাংলায় সে বললে--যো মিলা সো এই দেখো।

—চার্জশীট্?

—নহি। কালো চোখ দুটো তুলে নিস্পৃহ গলায় বোরহান বললে—কৈফিয়ৎ দিতে হোবে।

এমদাদ কাগজখানার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখল, হাঁ, এক্‌স্‌প্লানেশন সীট্‌ই বটে। বললে—কে দিয়েছে? ফোরম্যান?

—জী, হাঁ। চার্জম্যান রিপোর্ট কিয়া…প্রায় মুখস্থের মতই নিখুঁত ভাবে বোরহান তার লাঞ্ছনার কাহিনীটা বলবার উদ্যোগ করছিল। কিন্তু এমদাদ এতই ক্লান্ত বোধ করছিল যে একটু আপত্তি করে বিনয়ের সাথে সে বললে—বুড়ো মিয়া, তুমি ভাই সন্ধ্যার পরে ইউনিয়ন অফিসে একবার যেয়ো। আজ না, কাল যেয়ো। আজ অফিসে বোধ হয় কাউকেই মিলবে না।

অগত্যা, বোরহান ধীরে ধীরে তার বাসার দিকে রওনা দিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই তার মনে পড়ল, ওহো, একবার বাজারের মধ্যে তো ঢুকতে হবে। বুড়ীর জন্যে একটু সুর্মা খরিদ করতে হবে আর বহুর জন্যে দরকার একটা চিরুনি। ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা চিরুনির ভাঙা টুক্‌রো বুড়ীর আছে। তা দিয়ে অবশ্য বুড়ীর পাকায়-কাঁচায় মেশানো স্বল্প পরিমাণ চুল সামলানো যায় বটে, কিন্তু বেটার বউয়ের তো তা দিয়ে হয় না। এক রাশ চুল মাথায়, মেয়েটা এলোকেশী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। রহমতটা একেবারেই বেহুঁশ। কারখানা থেকে ফিরে বাবু একবার বের হবেন তো ফিরবেন সেই রাত দশটায়। খালি চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়া শিখেছেন। আরে বেটা! নিজ ঔরৎ-এর সুখ দুখের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হয়—ওটা ফেল্‌না জিনিস নয়। বুঝ্‌বি বেটা ঠিকই একদিন, তবে ওয়াখ্‌ত্‌ তখন থাকবে কি না কে জানে! দুঃখ দৈন্যের সংসারে অবহেলিত তার মায়ের অকাল মৃত্যুতে মুষড়ে পড়া অনুতপ্ত বাপের কথা তার মনে পড়ে যায়।

ময়লা সার্টের পকেটে থ্যাবড়া লোমশ হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে খুচরো পয়সাগুলো বের করে মনে মনে একবার হিসেব কষে নিল বোরহান। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে যেই সে দেখল যে সেখানে পাঁজা পাঁজা ঘন কালো মেঘ এসে জমতে শুরু করেছে, অমনি তার মেজাজটা বিগড়ে গেল—শালা, হারামি কা বাচ্চা! অব্‌ শালা রাতভর বর্ষাবে।

আশ্চর্য! মাত্র চার পাঁচ মাস আগেও কিন্তু কারখানা

থেকে ফিরে আসার পরে, সাঁঝের ঠিক আগে রাতভর বর্ষণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যখন কালো সজল মেঘগুলো এমনি করে আকাশের কোলে এসে জমতে থাকত, তখন তার মনে রঙের ছোঁয়াচ লাগত—আই ঘেরী বাদরী! আস্তে আস্তে রাত ঘন হয়ে আসত। বারান্দার এক ধারে পাতা উনুনের পাশে মাতুরখানা বিছিয়ে নিয়ে বুড়ো বুড়ি নীরবে কি যেন ভাবতে ভাবতে খাওয়া দাওয়া সেরে নিত। সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পানটা মুখে পুরে দিয়ে ঘরে গিয়ে প্রশস্ত দড়ির খাটিয়াটার উপরে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসত বোরহান। পান চিবুতে চিবুতে আরামে চোখ দুটো তার বুজে আসত। নরম হয়ে সেই পানটা মুখের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই সে অমনি চোখ বুজে ডাকত—আম্নুয়া কি মাঈ!

—হাঁ, ঠাহারো······আম্নুয়ার মায়ের জানাই আছে এবার স্বামীর কি লাগবে। রাতের তামাকটা বরাবর তিনিই সেজে দিতেন। সকাল ও বিকালের তামাকটা আগে বড় মেয়ে আস্‌মা সেজে দিত। আস্‌মার বিয়ে হয়ে যাবার পর আজ বছর তিরিশেক ধরে তামাক সেজে দেবার পুরো দায়িত্বটাই আস্‌মার মাকে নিতে হয়েছে। কলকের আগুনটা একটু গন্‌গন্‌ করে উঠতেই, নল সমেত গড়গড়াটি এনে অতঃপর আম্নুয়ার মা অধৈর্য স্বামীর হাতে সেটা তুলে দিতেন। ভাল খাম্বিরার গন্ধে ছোট ঘরটা মাৎ হয়ে যেতো। তামাক পর্বও শেষ হত, আম্নুয়ার মাও দরজাটা দিয়ে এসে স্বামীর কাছে ঘেঁসে বসতেন। সুস্বাদু পান আর সুগন্ধি তামাকের মতই

মিঠে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে একান্ত খুঁটিনাটি ভাবে পরিচিত আম্বয়ার মায়ের শুকনো ক্ষীণ দেহখানা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিসের মত অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে বুকের উপরে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে নরম ভাবে জড়িয়ে ধরে বোরহান ডাকতো—মেহেরু!······হাঁ, রাতে একান্ত নিভৃতে বোরহান তাকে আজো এই নামেই ডাকে। আম্বয়ার মা কোনও জবাব দিত না। শান্তভাবে বোরহানের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকত শুধু। বোরহানের মনে হত, পঞ্চাশ বছর আগেও তো মেহেরু আর সে ঠিক এমনিই ছিল। তা হলে বুঝি, বয়স জিনিসটা জামা কাপড়ের মতই বাইরের খোলস মাত্র! আসল মানুষটির বোধ হয় বয়স বলে সত্যি কোনও জিনিসের পরিমাপ করা যায় না। যেমন যায় না তার এবং মেহেরুর বয়সের কোনও পরিমাপ করা। অথবা তাদের আভ্যন্তরিক সম্পর্কটা বদলায়নি বলেই বোধ হয় এরকমটা মনে হচ্ছে, মা বাপের কাছে সন্তানদের বয়সটা যেমন চিরদিন একই রকম থেকে যায়। আস্তে আস্তে ওদের চেতনা নিভে আসে। বাইরেও নামে ঝমঝম বৃষ্টি।

মনে হয়, সারা দিনটার কুটিলতা আর নিষ্ঠুরতার সাথে এই কোমল রাতটুকুর কোনও দিক দিয়েই যেন কোনও মিল নেই। দেখতে দেখতে সামান্য খালাসী জীবনের কঠোর বাস্তব যেন একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায় বোরহানের স্মৃতি থেকে। পথে-ঘাটে ঐশ্বর্যশালী শহরবাসীর দাম্ভিক উপেক্ষা, ওয়ার্কস ম্যানেজারের তাচ্ছিল্য থেকে শুরু করে ফোরম্যান, চার্জম্যান,

মিস্ত্রির সূক্ষ্ম নিপীড়ন আর দারোগা পুলিশ, কাবুলী মহাজনের জুলুম পর্যন্ত কোনও রকমের অপমান লাঞ্ছনার কাঁটা স্বপ্নালু রাত্রির এই কাব্যময় বিলাসিতাটুকুর মধ্যে বেআদবের মত একটুকুও দাঁত ফোটাতে পারে না। এখানে যেন দুটো মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান-অনুভূতির সূক্ষ্ম এক অনায়াস প্রতিযোগিতা। এখানে শুধু অগাধ বিশ্বাসে একটি আত্মার কাছে আর একটি আত্মার পরস্পর অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন। মান সম্ভ্রম, আকর্ষণ, স্নেহ মমতায় ঘেরা অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণ এই দাম্পত্য রাত্রিটুকু। দিনের আলোর নির্মম বাস্তবতায় সে জীবনগুলি যতই অবহেলিত হোক না কেন, এই দাম্পত্য রাত্রিটুকুই তাদের অগাধ মর্যাদা উপহার দিয়ে মরুভূমির মাঝখানে ওয়েসিসের স্নিগ্ধতা নিয়ে যেন বিরাজ করছে।

বোরহান বাজারের দিকেই এগোচ্ছিল। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই সে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। মেঘের উদ্দেশে আবার এক দফা গালাগাল বের হল তার মুখ দিয়ে—শালা, হারামি কা বাচ্চা!

সাঁঝের বেলায় আকাশে মেঘ জমতে দেখলেই কিন্তু এখন তার আতঙ্ক হয়। কারণ, আজকাল রাতে বৃষ্টি হওয়া মানেই হচ্ছে সমস্ত রাত্রি বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে বারান্দার এক কোণায় বুড়ো বুড়িতে জড়সড় হয়ে বসে বসে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করা। তার কোয়ার্টার বলতে একখানাই মাত্র বেড়ার ছোট

ঘর। মেঝেটা পাকা এই যা কিছু সুবিধা। বারান্দার এক কোণায় পাতা উনুনে রান্নাবান্না করে নিতে হয়। জলও নিয়ে আসতে হত বাইরের টিউবওয়েল থেকে। তবু তো একটা পায়খানা আছে, তাই কোনও মতে মেয়েদের আব্রু রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। কোন কোন ব্যারাকে তাও নেই। সে যা হোক, যতদিন রহমত্ আর তার বউ এখানে ছিল না, ততদিন অন্তত শোওয়া বসার বিশেষ কোনও অসুবিধা হত না। কিন্তু আজ চার পাঁচ মাস হল ওরা পাহাড়তলী থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছে, সেই হতে শোওয়া বসারও বড্ড অসুবিধা দেখা দিয়েছে। দুই কামরাওয়ালা কোয়ার্টারের জন্য দরখাস্ত করে করে হয়রান হয়ে গেছে বোরহান। বার কয়েক দরখাস্ত করবার পর কর্তৃপক্ষ একবার জানিয়েছিলেন যে খালাসীদের জন্য ডবল কামরা কোয়ার্টার দেওয়া হয় না। এই রকম হৃদয়হীন নির্লজ্জ জবাবে অত্যন্ত বিরক্তবোধ করেছিল বোরহান। খালাসী হয়েছে বলে, বুড়ো বাপ মা, বেটা, বেটার বউ, শেয়ানা ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে গাদাগাদি করে এক ঘরে থাকতে হবে! কেন, খালাসীদের ইনসানি বলে কিছু থাকতে পারে না? ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলে অফিসার বিশেষের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে বলেছিল সে—শালা, রাণ্ডীবাজ জানোয়ার! সবকো এ্যায়সা হি জানোয়ার সমঝ্তা।

অবশ্য বোরহান তবুও একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি। ইউনিয়ন মারফত ফের দরখাস্ত পেশ করেছে,—বেশ তো বাপ বেটা দুজনেই তো রেলের লোক। একটা ডবলকামরা

কোয়ার্টারে দুটো কামরা আলাদা আলাদা ভাবে বাপ বেটার নামে ধার্য করে দাও তবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষও সেই থেকে চুপ মেরে গেছে। বেটা, বেটার বউকে তাই ঘরখানা ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ কর্তৃপক্ষ চোখ কান বুজে থাকলেও, বাপ মায়ের পক্ষে তো আর চোখ কান বুজে থাকা সম্ভব নয়। জোয়ান বেটা, ডাগর বউ, ওরা লাজে শরমে তো বোবা হয়ে থাকবেই। তা বলে, ওদের উপরে কি এমনটা বেরহম অত্যাচার দিনের পর দিন করা চলতে পারে? খাওয়া দাওয়ার শেষে উনুনের পাশটা ভাল করে সাফসুফ করে নিয়ে বারান্দাতেই অগত্যা বিছানা পেতে নিতে হয় বোরহান আর আসুয়ার মাকে। ঝড় বৃষ্টি না নামলে রাতে তেমন কষ্ট হয় না। গরমের দিনে পোকা মাকড়ের ভয়, এই যা। তা, আসুয়ার মা, মশারি ফেলে অতি যত্ন সহকারে সেটা ভাল করে গুঁজে নেন। পোকা মাকড়ের বিরুদ্ধে এও অনেকটা প্রাথমিক রক্ষা ব্যবস্থার মত। কিন্তু মুশকিল হয় ঝড় বৃষ্টি নামলে। তখন আর কোনও বুদ্ধি নেই। ছোট্ট বারান্দাখানা পাঁচ মিনিটেই ভিজে চুপ্সে যায়। বিছানাপত্র জড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় গাদা করে গুটিশুটি করে তার উপরেই বসতে হয়। ঘরের ভেতরে একটা চাপা পরামর্শ হয়তো শোনা যায়। দরজাটাও হয়তো বা একটু পরে খুলে যায়—আব্বা, অন্দর মে আও।

বোরহান মনে মনে বড় খুশি হয়। হাঁ, বেটার মধ্যে তমিজ আছে। আর বহুয়াটাও বড় ভাল। হবে না? নিজে দেখে শুনে পছন্দ করেছে সে। বুড়ো হলেই কি আর চোখের

তেজ কমে ? মোটেই না। বরং কখনও কখনও দৃষ্টি আরো চোখাই হয়। বোরহান বেটা বেটার বউয়ের দিকে তৃপ্তির সাথে তাকায়, ছোট ছেলে মেয়েরা সন্থ কিনে আনা পছন্দসই খেলনার পুতুলের দিকে যেমন অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে।

—আ যাও আব্বা জান···রহমত্ অনুরোধ করে।

—নাহি বেটা। তুম শো' যাও···বোরহান ছেলেকে বলে —ঘরমে বহুৎ গরম বেটা।

রহমত বোঝে, আব্বাজান বাইরেই থাকবে। আম্মাও তাই। আসুয়ার মা দেশালাই জ্বালিয়ে স্বামীকে একবার হয়তো তামাক সেজে দেন। বোরহান গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে থাকে। আসুয়ার মা ক্লান্ত হয়ে গুটিশুটি আধা শোওয়া আধা বসা অবস্থাতেই ঘুমোতে থাকে। বোরহানের চোখে আর ঘুম আসে না। সে থেকে থেকে তামাক টানে আর মাঝে মাঝে অপূর্ব সহানুভূতি মাখা চোখে ঘুমন্ত আসুয়ার মায়ের শীর্ণ দেহটির দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখে। দেখতে দেখতে বর্ষার ছোট্ট রাতখানা ভোর হয়ে যায়। ভোঁ বেজে ওঠে। ক্লান্ত শরীরটা যেন টানতে টানতে হিঁচড়িয়ে নিয়ে সেদিন বোরহান কারখানায় যায়।

বাজার থেকে সুর্মা আর চিরুনি কিনে নিয়ে বাসায় ফেরা পর্যন্ত মেঘ কেন জানি আর অপেক্ষা করল না। নগদ নগদই বেশ খানিকটা ঝিরঝির করে ঝরিয়ে দিয়ে গেল। উনুনের ধোঁয়া আর কেরোসিন কুপির নিষ্প্রভ আলোয় মাখামাখি হয়ে

ম্লান সন্ধ্যায় মহল্লায় মহল্লায় সারিবদ্ধ কোয়ার্টারগুলি বোবার মত সজল চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন কাঁদছিল। বোরহান যখন বাসায় ফিরল তখন সে বৃষ্টিতে একদম ভিজে গিয়েছে।

—রহমতোয়া! এ রহমতোয়া······বোরহান দরজায় ধাক্কা দিল।

ভেতর থেকে দরজাটা নীরবে খুলে গেল। বোঝা গেল, বউ খুলে দিয়েছে। আম্বুয়ার মা কয়লা ভাঙছিল। বোরহান এদিক ওদিক তাকাল, রহমত নিশ্চয়ই এতক্ষণ বেরিয়ে গেছে। তার মেজাজটা একটু চড়ে গেল। ও কি একটু আরাম করতেও জানে না? বোরহানের গলাটা পরক্ষণেই কিন্তু নরম হয়ে এল, আর আরাম করবেই বা কোথায়? একটাই মাত্র ঘর।

বউ একটু শরম পেয়ে চলে যাচ্ছিল, বোরহান চিরুনি আর সুর্মা তার হাতেই দিয়ে দিল।

কি ভাবে কৈফিয়তটা তৈরি করতে হবে, মনে মনে বোরহান তা কতকটা ঠিক করেই ফেলেছিল। পরদিন সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই সে ইউনিয়ন অফিসের দিকে রওনা দিল। অফিসে তখনও বিশেষ কেউ আসেনি। এমদাদ আলি একলাই চেয়ার টেবিলে বসে বসে কি একটা লিখছিল। বোরহানের কাগজ-পত্রে চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিয়ে মৃদু হেসে সে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার বল তো?

—একদম ঝুঠ্······ধীর গলায় উত্তর দিল বোরহান।

—চার্জম্যানের রিপোর্ট যে বলছে, মিস্ত্রিও সাক্ষী আছে ?··· জেরা করবার মত করে জিজ্ঞাসা করল এমদাদ।

—উহ্ শালা তো ঔর এক হারামি······বেঞ্চখানা একটু সম্মুখে টেনে নিয়ে বসতে বসতে বোরহান ব্যাখ্যা করে বললে, যখন তখন একে ওকে ক্যানটিনে পাঠাবে, চা লাও, পান লাও, ইয়ে লাও তো উহ লাও! বলতে বলতে হঠাৎ সে গর্জন করে উঠল—ক্যা, হমলোগ উস্‌কা খরিদা গোলাম হ্যায় ?

কথা বলতে বলতে মিস্ত্রির ছোট খাটো অশোভন আচরণগুলি যতই মনে পড়ছিল, ততই কেন যেন আজ তার কাছে সেগুলি একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল। বোরহান বলে চলল, মিস্ত্রিটা এমন বেতমিজ যে একদিন তার মত বয়স্ক লোককেও ক্যানটিনে পাঠাতে চেয়েছিল। তা সে অবশ্য ঝগড়া কাজিয়া কিছু করেনি বটে, তবে পাকে-প্রকারে সাফ বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তাকে দিয়ে ও সব চলবে টলবে না।

এমদাদ চুপ করে শুনল। কতকগুলি মিস্ত্রির অবশ্য এ রকম স্বভাব যে না আছে তা নয়। সে বললে—ও, এই গোঁসাতে বুঝি সে তোমার বিরুদ্ধে লেগেছে ?

—জি, হঁা।······আস্তে একটু কাঁপা গলায় বোরহান জবাব দিল।

—তা, তোমার জুটিটাও যে তোমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে ?........ এমদাদ আবার প্রশ্ন করলো।

—পহেলা নম্বর বেইমান তো উহ্ হি লওণ্ডা!···সত্যিকার একটা ঘৃণায় বোরহানের মুখটা এবার একটু বিকৃত হয়ে উঠল।

আরে, তুই হচ্ছিস সেদিনের ছোক্‌রা, আর বোবহান তোর নানার বয়সী লোক! প্রোমোশনের লালোচে এই সব চ্যাঁচড়ামি তুই শুরু করেছিস? নাঃ, দুনিয়াটা এতদিনে ষোল আনাটাই জাহান্নাম বনে গিয়েছে। বোরহানের মন একটা গভীর নৈরাশ্যে ভরে উঠল।

—কিন্তু এতগুলো লোকের সাক্ষী তোমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, বুড়ো মিয়া, এই সব কৈফিয়ত কি টিকবে?....সন্দিহানভাবে কাগজপত্র উলটে পালটে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল এমদাদ—তোমার মিস্ত্রির নাম কি?

—আনোয়ার মিস্ত্রি।

—সেই কাঁচড়াপাড়াওয়ালা?....এমদাদের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুঠে উঠল্।

—জি, হাঁ।

এমদাদ আলি এবার সত্যিই কিছুটা ধাঁধাঁয় পড়ে গেল। আনোয়ার মিস্ত্রিকে সে বহুকাল থেকে জানে। চব্বিশ পরগণার লোক। কাঁচড়াপাড়া থাকাকালে এক সাথে ইউনিয়নের কাজও করেছে বহু। দেশ বিভাগ কালে দাঙ্গায় আনোয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নানাভাবে। পাকিস্তানে শান্তিতে ঘর বাঁধতে পারবে বলে অপ্‌শন দিয়ে চলে এসেছিল। কিন্তু বেচারি এখন বড়ই মনমরা হয়ে থাকে। এরকম ধরনের উদ্ধত অফিসারের অধীনে কাজ করবার কোনও অভিজ্ঞতা তার ছিল না। সেকালের লালমুখো ইংরেজ অফিসারগুলোও বিদেশ বিভুঁই বলে এখানকার মানুষকে মনে মনে তবু কিছুটা ভয়

ডর করে চলত। কিন্তু এখনকার এরা যে নিজেদের কি এক লাট বেলাট মনে করে তা এরাই জানে। একজন মিস্ত্রির সম্মানকে তুচ্ছ কারণে ক্ষুণ্ণ করতে যে এদের একটুও বাধবে, আনোয়ার তা মনে করে না। তাই সর্বদাই সে শঙ্কিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন টিউনিয়নের সাথে সম্পর্কও আর সে বড় একটা রাখে না। তবে তার সাথে ব্যক্তিগত খাতির এমদাদের এখনও অটুট আছে। দেখা সাক্ষাৎ হলে মাঝে মাঝে তর্ক বিতর্কও হয়। আনোয়ার অবশেষে হয়তো স্বীকার করে যে হাঁ, সময়ের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এবং কালে হয়তো এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতও হবে। কিন্তু এমদাদ বেশ বুঝতে পারে যে আনোয়ারের কণ্ঠস্বরে তখনও সন্দেহ ও নৈরাশ্যের একটু রেশ লেগেই থাকে। সে যা হোক, আনোয়ারের যতই পরিবর্তন হয়ে থাকুক না কেন, তুচ্ছ কারণে আক্রোশ বশত এতটা কাউকে মিথ্যে হয়রানি কববার মত অধঃপতন যে তার হতে পারে না, এ বিষয়ে এমদাদ প্রায় নিশ্চিত। কি একটু ভেবে বোরহানের বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে মিনতি করে এমদাদ বললে—তুমি না হয় কাল আর একবার এসো ভাই।

বোরহান কিছুটা ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় ফিরল। এমদাদের সাথে তার কথোপকথনের বিষয় স্মরণ করে মনটা তার একটু খুঁতখুঁতই করছিল বটে। কৈফিয়তটা তৈরি করতে গিয়ে আসল ঘটনাটা অবশ্য অনেকটাই এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গোটা দুনিয়াটাই যখন জাহান্নম বনে গিয়েছে, তখন কি আর বেহেস্তের নিয়ম কানুন দিয়ে তার মোকাবিলা করা সম্ভব?

তা ছাড়া, অন্যের কথা এত সে ভাবতেই বা যাবে কেন? ঐ লোভী কুত্তাটা যখন মিস্ত্রি আর চার্জম্যানকে এক সাথে ডেকে নিয়ে এসে তার এরকমটা অপমান করল, তখন কি সে এই বুড়ো মানুষটার জন্যে একটুও ভেবেছিল? আনোয়ার মিস্ত্রিকে অবশ্য তেমন দোষ হয়তো দেওয়া চলে না; চার্জম্যান সম্মুখে ছিল বলেই বোধ হয় সে অতোটা হম্বি তম্বি করেছে। কিন্তু তবু অবমাননার কথাটা মনে পড়ে যেতেই রাগে দুঃখে বোরহানের মনটা ফের শক্ত হয়ে উঠল। না, ভাল মানুষি করলে এ দুনিয়ায় অসহায়ের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আবার বোরহান যথারীতি ইউনিয়ন অফিসে গেল। অফিস ঘরের যে দিকটায় মেঝেতে চাটাই বিছানো থাকে, সেদিকটা আজ বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিকে ভর্তি হয়ে গেছে। এমদাদ আলি, ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতি শ্রমিক নেতারাও বসেছেন সেখানে। কথা উঠেছে, জিনিসপত্রের দর যে-রকম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তাতে বারে বারে খুচরো খুচরো কর্জা দাবি করে আর মাঝে মাঝে দু-চার টাকা খয়রাতির জন্যে চেঁচামেচি করে কোনও লাভ নেই; ওতে জাতও যায় অথচ পেটও ভরে না; তার চেয়ে আগেকার মত শস্তা মূল্যে জিনিস পত্র সরবরাহের জন্য গ্রেনশপ খোলার জন্য দাবি তোলা হোক। এই প্রসঙ্গে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন কিরকম ভাবে দেওয়া হবে না হবে, তাই নিয়েই কি সমস্ত আলোচনা হচ্ছিল। বোরহান ঘরে ঢুকে সালাম জানাল। তারাও প্রতি-অভিবাদনে সালাম জানাল। যাদের নিজেদের কোয়ার্টার সমস্যা আছে,

তারা কেউ কেউ সম্ভাষণ ছলে কোয়ার্টারের কথাই জিজ্ঞাসা করল। বোরহানের কাছ থেকে ব্যঙ্গ মেশানো সেই একই অভ্যস্ত উত্তর এল—এত্‌না জলদি !

কিন্তু ঘরের এই হাল্কা আবহাওয়াটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। একটু কৌতুক মাখা হাসি মুখে এমদাদ উঠে এসে বোরহানকে বললে—বুড়ো মিয়া, আনোয়ার মিস্ত্রির সাথে তো পোষ্টাফিসের মোড়ে আজ আমার দেখা হল।

বোরহানের মুখখানা নিমেষে কালো হয়ে গেল। এমদাদের চোখে বোরহানের মুখের চেহারার এই পরিবর্তনটুকু ধরা পড়াতে সেও যেন কিছুটা অপ্রতিভ বোধ করল। কুণ্ঠিত স্বরে সান্ত্বনা দেবার মত করে সে বললে—চার্জম্যানের সামনে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছ বুড়ো মিয়া, কৈফিয়তটা একটু নরম ভাবেই লিখতে হবে······চেয়ারখানা টেনে নিয়ে এমদাদ বসল।

বোরহান মুখ নিচু করে বেঞ্চে বসে থাকল। হঠাৎ মাথাটা তার এত ভারি বলে মনে হতে লাগলো যে সে যেন কিছুতেই তা তুলতে পারছিল না।

—ঐ জুটি ছোক্‌রাটা বাস্তবিকই একটা শয়তান···এমদাদ আনোয়ার মিস্ত্রির উক্তিটাই বিড় বিড় করে একবার আবৃত্তি করল—কেন বাপু! তোর কি এমন ক্ষতি হচ্ছিল যে, মিস্ত্রি আর চার্জম্যানকে ডেকে এনে ব্যাপারটা না দেখালেই হত না ?

বোরহান তখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেনি। পকেট

থেকে ফাউনটেন পেনটা বের করে টেবিলের উপরে এক গাদা সাদা কাগজ খোঁজাখুঁজি করতে করতে এমদাদ জিজ্ঞাসা করল —যে ক্যারেজের মধ্যে ওরা তোমাকে ধরেছে, সেখান থেকে তোমার ডিউটির জায়গাটা কতদূর ?

বোরহান মুখ নিচু করেই রইল। তবে জানাল যে রশিখানেকও হবে না এতটা দূরে যে বড় বোগিটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই তার সারাদিন ডিউটি ছিল।

—আচ্ছা সেদিন কি ভারী মেহনত কিছু করেছিলে ?···মনে মনে কৈফিয়ৎটার একটা মুসাবিদা দাঁড় করিয়ে ফেলবার জন্য একটি একটি করে পয়েণ্ট সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিল এমদাদ।

একটা পানিট্যাঙ্ক গাড়ির ছাদের উপরে চড়িয়ে ফিট করা হয়েছে, দুটো খুলে ছাদের উপর থেকে নিচে নামানো হয়েছে, আর একটা ফের কাঁধে করে গুদাম পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে, —মুখটা এতক্ষণে একটুখানি উপরে তুলে দৃঢ় অথচ শান্ত গলায় বোরহান কাজের তালিকাটা পেশ করলে।

এমদাদ একমনে খস্‌খস্‌ করে কাগজের উপরে কলম চালিয়ে খানিকক্ষণ ধরে ইংরেজীতে কি যেন সব লিখল এবং তারপরে তর্জমা করে বোরহানকে সেটা শুনিয়ে দিল ঃ ভারী ডিউটি ছিল। মেহনত হয়েছিল খুব। বুড়ো মানুষ আমি। বড় ক্লান্ত বোধ করছিলাম। ডিউটির ফাঁকে একটুখানি জিরিয়ে নেবার জন্য কাছেই একটা ক্যারেজের মধ্যে তাই শুয়েছিলাম। ঠিক টের পাইনি তন্দ্রা কখন লেগে এসেছিল। বৃদ্ধ বয়স এবং মানবতার খাতিরে এবার মাফ করা হোক। এমনটা আর হবে না।

বোরহান মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনল। তবে, সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা ঠিক বুঝা গেল না। আপত্তি নেই অনুমান করে ইউনিয়নের রবার ষ্ট্যাম্প দিয়ে দরখাস্তের গায়ে সশব্দে একটা ছাপ মেরে বোরহানের দিকে সেটা এগিয়ে দিতে দিতে ভৎ'সনার সুরে এমদাদ বললে—এরকম আর ঘুমিও না বুড়ো মিয়া! আর, ছিঃ! এমন ঝুঠা বাত্ বুড়ো বয়সে বলা কি ঠিক?

বোরহান বেশ ধীরে সুস্থেই হাত বাড়িয়ে দরখাস্তটা নিচ্ছিল। কিন্তু কথাটা শুনতে শুনতে হঠাৎ তার মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল—এ ভি ঝুঠ্ আছে!……এমদাদের হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজখানা টেনে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে সেটা দুমড়ে মুচড়ে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলল সে। তার পরেই, টেবিলের কাগজগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চড়া গলায় ঠিক ডিক্‌টেশন্ দেবার মত পরিষ্কার করে থেমে থেমে সে বললে—অব, যো সহি উওহি লিখো। লিখো…বুঢা হইলেও হমার গায়ে তাকত আছে। ডিউটির টাইমে নিন্দ্ যাওয়া হমার আদত্ না। লেকিন হামি ইনসান আছি। জানোয়ার নহি আছি। যবতক্ হমার ডবল কামরা কোয়ার্টার না মিলবে, তব তক্ রাতে পানি বর্ষাইলে দিনে ডিউটির টাইমে হামি কভি কভি নিন্দ্ যাইবে।

বোরহানের কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক সত্যাশ্রয়ী স্পর্ধা ফুটে উঠল।

ঘরের অন্যান্য লোকেরা চমকে গিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টে তাকাল। বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে

এমদাদের চোখের দিকে চেয়ে রইল বোরহান। তাব মনে হল, রাত্রির আঁধারে আপন ঘরের মাঝে তার আত্মা যেমন এক অপূর্ব মর্যাদার সৌরভে চিরদিন সুরভিত, এইক্ষণেও ঠিক যেন সেই রকম মর্যাদার এক ঝলক সুরভি বাতাসে তার চারিদিক গন্ধে ভুর ভুর করছে।

এমদাদ কিচ্ছু বলল না। কিন্তু চমৎকৃত হয়ে বোরহানের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখল।

সীমানা

শনিবারের দিন। বেলা সাড়ে বারোটাতেই আজ উত্তর-বঙ্গের এই রেলওয়ে কারখানাটির ছুটি হয়ে গেছে। ঘামে ভেজা, তারপিন আর গ্রীজের গন্ধে ভুরভুর তেলকাট্টাওয়ালা জামা-কাপড়পরা কারখানা ফেরতা শ্রমিকদের পনেরো আনাটাই এতক্ষণ তাদের নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। রাস্তায় এখন ভিড় নেই বললেই চলে। ভিড় বরঞ্চ তখন জমে উঠেছে মহল্লায় মহল্লায় টিউব্ওয়েলের চতুর্দিকে। আশপাশের পল্লী অঞ্চল থেকে যারা শাক শব্জি দুধ দই বিক্রি করতে এসেছিল শহরের বাজারে, রাস্তায় এই সময়টা তাদেরই শুধু মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। ওরা বেচা কেনা শেষ করে তহবিল মিলিয়ে আপন আপন প্রয়োজনীয় সওদাপত্র খরিদ করে এতক্ষণে বাড়ি ফিরছে। রাস্তার মোড়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দু একখানা সাইকেল-রিক্সা। রিক্সাওলারা দাঁড়িয়ে অলস মেজাজে বিড়ি টানছিল।

মেস থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে বাসায় ফেরার জন্য আবদুর রহমান যখন রাস্তায় বের হল তখন সূর্যটা ঠিক মাথার উপর থেকে বেশ কিছুটা পশ্চিমে সরে গিয়েছে। বাসায় যাবার পথে, মুরারীর দোকানে পান কিনতে গিয়ে আবদুর রহমান বল্লে—আচ্ছা মুরারীদা, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো?

—আমি ?……চুন খয়ের মাখানো পানে, কুচি সুপারির সাথে কয়েকটা দানা মৌরী দিয়ে দুই হাতের আঙুলে সেটাকে বেশ গোল করে মুড়তে মুড়তে বিস্ময়ে মুরারী তার দিকে তাকাল।

—হাঁ……..স্মিত হাস্যে আবদুর রহমান বললে—পারলে তুমিই পারবে।

—বলুন……পানের সাথে বোঁটায় করে চুন এগিয়ে দিল মুরারী।

—আচ্ছা……দোকানের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে এক হাত দিয়ে এলিয়ে পড়া চুলটা ঠিক করে সরিয়ে রাখতে রাখতে আবদুর রহমান জিজ্ঞাসা করল—কোনও হিন্দু মেয়েকে যদি চিঠি লিখতে হয়, তবে কি দিয়ে লেখাটা শুরু করতে হয় বল তো ? এই যেমন ধর……আর একটু ব্যাখ্যা করে সে বললে—একখানা চিঠি লিখতে আমরা যেমন শুরু করে থাকি আস্‌সালাম ওয়ালেকুম্ দিয়ে।

মুরারীর বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। তবু সেই ভাবটা চেপে রেখে, যাকে বলা হয়ে থাকে ব্যবসায়ী ভঙ্গি, অনেকটা সেই ঢঙে নিস্পৃহ গলায় সে উত্তর দিল—ও, পাঠ লেখার কথা বলছেন ? তা বয়োজ্যেষ্ঠা হলে লিখতে হবে শ্রীচরণকমলেষু, অথবা লিখুন পরমপূজনীয়া ; আর যদি কনিষ্ঠা হন তবে লিখবেন পরমকল্যাণীয়াসু।……মুরারী দস্তুর মতো মাইনর পাস করা। ব্যাকরণের বিধানের মতই আটসাঁট করে সে কথাগুলি বললে।

উত্তরটা যথাযথভাবে মনে মনে একবার অনুধাবন করে নিয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে মুরারীর মুখের দিকে চেয়ে আবদুর রহমান যেন অনেকটা আপন মনেই আস্তে আস্তে বললে—তাও তো বটে। বয়সে ছোট না বড়। সেও তো একটা কথা!

ব্যাপারটা মুরারীর কাছে ক্রমাগতই বেশি বেশি রহস্য-জনক বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত ঔৎসুক্য দেখানোর স্বভাব আজকাল তার নেই। দেশ বিভাগের পূর্বে হলে হয়তো হৃদয়-ঘটিত কোনও ব্যাপার সন্দেহ করে একটুখানি রসিকতা না করেও মুরারী ছাড়ত না। কিন্তু দিনকাল ঠিক আগের মতো তেমনটি আর সরস নেই। আজকাল হচ্ছে মাপা জোখা করে চলবার দিন, তা ছাড়া সংখ্যালঘু হিন্দু মেয়েদের আত্মসম্মানের প্রশ্নটাও বর্তমান ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটির সাথে জড়িত হয়ে আছে। সুতরাং সে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। তবু, আবদুর রহমানের হাবভাব দেখে মুরারী মুচ্‌কি মুচ্‌কি একটুখানি না হেসে পারল না। কিন্তু আবদুর রহমান এতখানি অন্যমনস্ক ছিল যে সেই মুচ্‌কি হাসিটুকু তার চোখে পড়ল না। সে দড়ির আগুন থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে পানের পয়সা দিয়ে চলে গেল।

টাইম্‌পিসের দিকে চেয়ে মুরারী দেখল দুটো বেজে গিয়েছে। এই সময়টা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য দোকান বন্ধ করে সে বাড়ি যায়। ক্যাশবাক্সে তালাচাবি মেরে উঠে দাঁড়াল সে। এমন সময়ে রোদের মধ্যে খালি মাথায় কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঘেমে চুপ্‌সে জব্‌জবে হয়ে

বাস্থ এসে হাজির—মুড়াড়ী বাই! আব্দর্ রম্মান্ কো দেকা?

অল্প বয়স, কালো, বেঁটে কিন্তু বেশ সুগঠিত চেহারা, ছোট করে ছাঁটা চুল, বাস্থর কেতাবী নাম হচ্ছে আবদুস্ সালাম। কিন্তু, সেই নামে কেউ তাকে চেনে না। অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার কোনও এক গ্রামে তার বাড়ি। কাজ করত ভাইজাগ পোর্টে অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের তীরে ভিজাগাপট্টম্ বন্দরে। সেখান থেকে তার যে সমস্ত সহকর্মী দেশ-বিভাগের সময়ে 'অপশন' দিয়ে এখানে কাজ করতে এসেছিল, তাদের দৌলতেই সে এখানে বাস্থ নামে পরিচিত। তার সেই সমস্ত সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ রিটায়ার করে, ছাঁটাই হয়ে কিংবা ভাঙা মনে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছে; কেউ কেউ এখান থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছে; দু-একজন চলে গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। একমাত্র সে-ই এখানে কেমন করে টিকে গেছে আর টিকে গেছে তার এই নামটি। বাস্থ, আবদুর রহমানের কথাটা জিজ্ঞাসা করে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সে কি যেন একটা বিষয় চিন্তা করছিল। মুরারী জিনিসপত্রগুলি গুছাতে গুছাতে বল্‌লে—দেখা তো বটে বাস্থ মিয়া! রহমান সাহেব তো একটু আগেই পান খেয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় গেলে যে এখন তাঁর পাত্তা পাবেন তা বলতে পারা কি আর আমার সাধ্য?

বাস্থ কিছু আর জিজ্ঞাসা করল না। কোথায় গেলে

এখন আবত্নর রহমানকে পাওয়া যেতে পারে সেই কথাটাই আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিল সে।

আবত্নর রহমান আর বাস্থ বয়লার শপে এক সাথেই কাজ করে। বাস্থর চেয়ে সামান্য কিছু বয়সে বড় হলেও, তুইজনে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবত্নর রহমানের কোনও হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার থাকলে, বাস্থর খুব সম্ভব তা না জানবার কথা নয়। হিন্দু মেয়ের প্রসঙ্গটি বাস্থর কাছ থেকে একটুখানি খুঁচিয়ে জানবার জন্য তাই মুরারী আর একবার প্রলুব্ধ হল। সে তো নির্বোধ নয়। সে কি আর সোজাস্থজি জিজ্ঞাসা করবে? সে হেসে কথাটাকে ঘুরিয়ে এই ভাবে উত্থাপন করবেঃ কি বাস্থ মিয়া! হিন্দু লেড়কীকে খত্ লিখতে হলে কি দিয়ে শুরু করা দস্তুর তাই নিয়ে বুঝি আপনাদের মধ্যে খুব বাহাস্ হয়ে গিয়েছে? কিন্তু, না। মুরারী সে প্রলোভনটা সামলে নিল। সে অন্য বিষয়ের দিকে গেল। উঁচুতে টাঙানো একখানা কাঠের তক্তায় ক্যাশবাক্সটা তুলে রাখতে গিয়ে উপর থেকে টিনের একটা চোঙা নিচে পড়ে যেতেই সে বললে—বাস্থ মিয়া, আপনাদের ইউনিয়নের ঝাণ্ডা আর চোঙা দেখছি আমার দোকানেই থেকে থেকে ছাতা ধরে পচে যাবে! ওগুলো আপনারা নিয়ে যাবেন না?

—হাঁ। এতোয়ার কো······নির্বিকার ভাবে বাস্থ ডাইনে বাঁয়ে এমন নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল যে দেখলে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে কথাটা সম্মতিস্থচক অথবা অসম্মতিস্থচক।

কিন্তু মুরারী অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই তার বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না।—এতোয়ার কো !······হেসে একটু বিদ্রূপের সাথে মুরারী বললে—সোম থেকে শনি, সমস্ত বারগুলি একে একে যায় আসে আর আপনাদের এতোয়ারটা বুঝি হ্যালি সাহেবের ধূমকেতুর মত পঁচাত্তর বছর পর পর ?

মাঝে মাঝে মুরারী এদের উপর বাস্তবিকই বড় বিরক্ত বোধ করে। একে তো দোকানে জায়গার একান্ত অভাব, তাতে আবার ওরা এই সব চোঙা ঝাণ্ডা পোস্টার এক রাশ হাবিজাবি নিয়ে এসে এখানেই স্তূপীকৃত করে চাপাবে। গেট মিটিং উপলক্ষ্যে একবার যদি ওগুলো কারখানার গেটে এল, তা হলে তো সহজে সেগুলি আর ওদের ইউনিয়ন অফিসে ফিরে যাবে না ! এক এক দফায় দেড়মাস দু' মাস ধরে এই দোকানেই পড়ে থাকবে। গেটের উপরে দোকান হওয়ায় এই হয়েছে এক ঝক্‌মারি। আগেকার দিনের ইউনিয়নওলাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই এরা যেন তার দোকানের উপর এই অধিকারটুকু পেয়ে গিয়েছে। মুরারীর মাঝে মাঝে ভয় করে, কি জানি এজন্য যদি পুলিশ গোয়েন্দারা তাকে ধরে আবার টানাটানি করে ! অপর দিকে এ লোকগুলোকেও চটানো সে সমীচীন মনে করে না। রুই কাত্‌লা, চুনো পুঁটি সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা নেহাত কম হবে না। সুতরাং এতগুলো খদ্দেরকে হাতছাড়া হতে দেওয়া দোকানদার হিসেবে সে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে না।

কিন্তু, আরো একটা কথা আছে। মুরারীর নিজ গ্রামখানা আজো ছত্রভঙ্গ হয়নি। হিন্দুরা সবাই দল বেঁধেই রয়ে গেছে। তার গ্রামের বাড়িখানা আজো সে তুলে দেয়নি। তার ছোট ভাই, বৌ নিয়ে, বৃদ্ধা এক বিধবা কাকীমার সাথে সেই বাড়িতেই থাকে। গ্রামে মুরারীর যাতায়াতও আছে বটে; কিন্তু শহরে কাছেই একটা মহল্লায় এই পানের দোকানের দৌলতে একখানা বাড়ি করেছে সে, গত মহাযুদ্ধের সামান্য কিছুদিন আগে। নিজ হাতে রোপণ করা ডাগর ডাগর আম কাঁঠালের সবুজ পল্লবে ছেয়ে যাওয়া গাছগুলো পুরো মাত্রায় ফল দিতে আরম্ভ করেছে আজ বছর চার পাঁচ হল। এই ছায়া সুশীতল ছোট্ট পাকা বাড়িখানার কী যে এক মোহিনী মায়া! দেশ বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত নানা রকমের দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও স্ত্রী পুত্র নিয়ে মুরারী এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। মুরারীর স্ত্রী ঠিক বুঝতে পারে না এখানে এমনি করে থেকে যাওয়াটা আসলে ভাল হচ্ছে, না মন্দ হচ্ছে। কিন্তু স্বামীর বিচার বুদ্ধির ওপর তার প্রচুর আস্থা। মুরারী তার এই বাড়িখানার উল্লেখ করে বলে—বুঝলে বীণা, যদি টিকে যাই তবে এই মায়াবিনীর জন্যেই ভাল করে টিকে গেলাম। আর যদি মারা পড়ি তবে বুঝতে হবে এই মায়াবিনীই আমাদের গিলে খেয়ে ফেলল। মুরারীর স্ত্রী বুঝতে পারে যে মুসলমান অধ্যুষিত এ রকম একটা বিরাট এলাকায় হিন্দু হয়ে বিশাল সাগরের বুকে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত টলটলায়মান অবস্থায় যে ভাবে থাকা

হচ্ছে তাতে তার স্বামীও খুব নিঃশঙ্কচিত্ত নয়। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়! কিন্তু ঐ ইউনিয়নওয়ালা লোকগুলোর উপর মুরারী যথেষ্ট ভরসা যে করে, এ কথাটাও ঠিক। তাছাড়া, নিজের মনের সাথে অনেক বোঝাপড়া করে মুরারী দেখেছে যে ঐ লোকগুলোর উপর যে তার কোনও আন্তরিক টান নেই সেটাও নয়। একটা টানও তার আছে। তার বিশ্বাস, ও লোকগুলো যদি বেঁচে বর্তে থাকে, তবে একদিন না একদিন এই পাকিস্তান একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ধরনের উন্নতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবেই। কারণ ওরা দেশকে ভালবাসে, দেশের মানুষকে ভালবাসে। দেশ-বিভাগের আগেও দেখেছে, এখনও সে দেখছে, যে-ধর্মেরই হোক আর যে-জাতেরই হোক ইউনিয়ন করা লোকগুলো যেন অনেকটা একই ছাঁচে তৈরি। মানুষগুলোকে মুরারীর মন্দ লাগে না।—তবে....

....ধুলো আর মাকড়শার জালে ভরা চোঙাটা ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে আপন মনে বিড়বিড় করে সে বলে—ওদের প্রত্যেকটির মাথায় একটু না একটু ছিট্ আছে।

মুরারী দোকান বন্ধ করল। দু পয়সার বিড়ি কিনে নিয়ে বাসুও একদিকে রওনা দিল।

অন্যদিন হলে বাসু হয়তো মুরারীর সাথে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক কথা বক্‌বক্ করে বলে যেত কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্য এক নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। নিত্যকার মত আজও সে ভোরবেলায় কারখানায় যাচ্ছিল। কারখানায় যাবার পথে ছোট একটা মাঠ তাকে অতিক্রম করতে হয়।

সেই মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু পথটি ধরে যেতে যেতে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে গেল উত্তর আকাশের দিকে।

বর্ষা কেটে গিয়ে কেবল ক'দিন হল শরতের নীল আকাশ-খানা দেখা দিয়েছে। কুয়াশাহীন স্বচ্ছ আকাশ। সূর্য তখনও ঠিক ওঠেনি। কেবলমাত্র সামান্য একটু লাল আভা দিকচক্রবাল রেখায় দেখা যাচ্ছে। বাসু দেখতে পেল উত্তর আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি পাহাড়ের চুড়া। সেই পাহাড়ের চুড়া দুটি থেকে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ আলো সমগ্র দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলার বাতাসের সমুদ্র যেন অবহেলায় সাঁতরিয়ে পার হয়ে, হিন্দুস্তান পাকিস্তানের বর্ডার চেক্‌পোস্ট ডিঙিয়ে কারখানার কাছে এই মাঠে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, ফিকে নীল বিশাল একখানা রেশমী চাদরের এক কোণায় হাল্‌কা বেগুনী রঙের অভ্রের অনেক-গুলো ঈষৎ সোনালী বর্ডার আঁকা পাত যেন স্তরে স্তরে সাজিয়ে ভাঙা-চোরা এলিয়ে পড়া পিরামিডের মত করে একটা ছোট আকারের নকশা তৈরি করা হয়েছে। বাসু মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল।

গত বসন্তকালেও একদিন পাহাড়ের চুড়া দুটি দেখা গিয়েছিল। সেদিন আবদুর রহমান ছিল সঙ্গে। আবেগে উৎফুল্ল গাইডের ভঙ্গিতে সে বলে চলেছিল, ঐ দেখা যায় হিমালয় পর্বতমালা! আর যে চুড়া দুটি দেখা যাচ্ছে, তাদেরই একটি হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপরটি ধবলগিরি। কারখানার পাশ দিয়ে যে রেল লাইন চলে গেছে, সেই

লাইন ধরে সোজা উত্তরে যদি চলে যাও, তবে এক জায়গায় গিয়ে পাবে চিলাহাটি স্টেশন। আমাদের পাকিস্তানের বর্ডার চেক্‌পোস্ট। আরো উত্তরে চলে যাও, পাবে হলদিবাড়ী, হিন্দুস্তানের বর্ডার চেক্‌পোস্টও সেখানেই। চলে যাও সোজা আরো উত্তরে, একে একে পাবে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ্। অবশেষে কালিম্পঙ্। এই্‌বার যদি সাহসের সাথে, শাল দেবদারু ঝাড় জঙ্গলের গভীর অন্ধকার ভেদ করে, বাঘ ভাল্লূক অজগরের গ্রাস এড়িয়ে, তুহিন শীতল তুষারকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে পার, তবেই তুমি পারলে হিমালয় পর্বত শ্রেণীকে লঙ্ঘন করতে, পারলে ঐ দেখা যায় পাহাড়ের চূড়াগুলি ডিঙিয়ে ওপারে যেতে। সেখানেই পাবে তুমি তিব্বত। আর তার পরেই শুরু হবে মহাচীনের অন্যান্য প্রদেশ—ফা হিয়েন্, হিউ এনথ্ সাঙ্, মাও সে-তুঙ্ আর চৌ এন-লাইয়ের দেশ! এই সেই চীন! উথ্‌লু বুল্ ইল্‌মা লাও কানা ফিস্‌সীন্! কূপমণ্ডুকতাকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য রসুলিল্লাহে সালাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লম এর সেই সুস্পষ্ট নির্দেশ: জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীনেও যেতে হবে!

কথা বলতে বলতে আবদুর রহমান সেদিন যেন ভাবাবেগে কবিতার এক অপূর্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি করে ফেলেছিল। পথের পরিচয় শুনতে শুনতে সেদিন বাসুও যেন অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ বোধে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। সেই ফাঁকে কখন যে ওই দৃশ্যটুকু সেদিন আকাশে মিলিয়ে গিয়েছিল তা সে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।

আজ সমস্ত দৃশ্যটুকু প্রাণ ভরে দেখে সে গভীর আনন্দ পেল। আজ পাহাড়ের চূড়া দুটো যেন আরো জীবন্ত; তারা যেন আজ আরো খানিকটা কাছে সরে এসেছে।

সারাদিন ধরে, থেকে থেকে, ভোর বেলায় আস্বাদিত সেই পুলকটুকু বাসু অনুভব করছিল। আর, সেই সঙ্গে আর একটি একান্ত অন্তরঙ্গ দৃশ্য তার মানসপটে বারে বারে ভেসে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল, পূর্ব গোদাবরী জেলায় গোদাবরী নদীর মোহনায় তার নিজ গ্রামে, টিলার মত উঁচু একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে এবড়ো খেবড়ো ঊষর লাল পাথুরে মাটি, আর তারই কোলে এখানে সেখানে বিরাট এক একখানা ফালি জুড়ে কালো উর্বর মাটির এক একটা আস্তরণ। কিন্তু তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে সারি সারি নারকেল কুঞ্জের অরণ্যে। আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে সেই সবুজ অরণ্য গিয়ে মিশেছে সম্মুখে বিস্তীর্ণ ঘন নীল ভারত মহাসাগরের মধ্যে। বাসু ঠিক জানে না, তবে শুনেছে যে সেখান থেকে অনেক অনেক দূরে রয়েছে এক ত্রিম্বক পর্বত, যার পাদদেশ থেকে না কি বের হয়ে নেমে এসেছে এই গোদাবরী। তারপরে, কত রাজ্য কত জেলা পার হয়ে, বন জঙ্গল জনপদ ঘুরে এঁকেবেঁকে বিরাট জলরাশি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারত মহাসাগরের এই নীল দরিয়ায়। যতদূর চোখ যায়, শুধু নীল আর নীল। কোথায় গিয়ে যে সেই দরিয়ার শেষ হল, আর কোথা থেকে ফের শুরু হল আশমানের সীমানা কে করবে তার হিসাব? এ যেন নীলে নীলে এক বিশাল একাকার।

বাসু, তার বাল্যে আর কৈশোরে কতদিন যে এই দরিয়ায় আশমানে একাকার হয়ে যাওয়া ব্যাপ্তিটার দিকে অসীম বিস্ময়ে চেয়ে থাকত, তা গুনে সে বলতে পারবে না। এটা ছিল তার কাছে সদা জাগ্রত একটা কৌতুহলের বিষয়। সে ভাবত ঐ দরিয়ার গভীরে যদি একবার ডুব দিয়ে ফিরে আসা যেত, ঐ আশমানটার মধ্যে একবার ফুঁড়ে সেঁধিয়ে যদি আবার বের হয়ে আসা যেত, তবে না জানি কত রূপকথার মত রহস্য সে উজাড় করে নিয়ে আসতে পারত। তার মনে পড়ে যেত, আরব্য উপন্যাসের সেই বিভ্রান্তমতি শারিয়ার বাদশাহের উজীরের মহিয়সী কন্যা শাহারজাদীর কথা। সে ভাবত, নিশ্চয়ই সবার অগোচরে শাহারজাদী পরীর মত পাখায় ভর করে অথবা মৎস্যকন্যার মত পাখ্‌না নেড়ে এই আশমান আর দরিয়া তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়াত নতুন নতুন রহস্যের সন্ধানে। না হলে এত কাহিনী সে জানত কেমন করে? আজো কি সবার অলক্ষ্যে রূপকথার কাহিনীর জন্য নতুন নতুন মাল মশলা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শাহারজাদী তেমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায় না? হঠাৎ একদিন যদি আশমানের নীল থেকে পাখায় ভর দিয়ে ঝুপ্‌ করে সে নেমে আসে, অথবা যদি দরিয়ার মাঝে ঢেউয়ের মাথায় সে পাখ্‌না নেড়ে ঝিক্‌মিক্‌ করে জেগে ওঠে! তাহলে বাসু খুঁটিনাটি করে সমস্ত রহস্য শাহারজাদীর কাছ থেকে জেনে নেবে। পরে বন্ধু বান্ধবদের কত যে কাহিনী সে শোনাবে। কিন্তু শাহারজাদীর সাথে তার এই গোপন অন্তরঙ্গতার কথাটি কিছুতেই কাউকে বলবে না। শাহারজাদী তো নিশ্চয়ই তাকে

দিয়ে সেই ওয়াদা করিয়ে নেবে। সে কি আর ছাড়বে? এখন ভাবলে বাসুর হাসি পায়, ছেলেবেলায় কতোদিন শাহার-জাদীর জন্য সত্যি সত্যি কত ব্যর্থ প্রতীক্ষার শেষে ক্লান্ত বাসু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অভিমান ভরে বাড়ি ফিরত।

সকালবেলার হিমালয়ের এক টুকরো দুর্লভ দৃশ্যের সাথে, তার সেই একান্তভাবে আপন অতীত স্মৃতিটির যোগসূত্রটুকু যে ঠিক কোন জায়গাটায় তা বাসু পরিষ্কার ভাবে ধরতে পারছিল না। কিন্তু একটা জিনিস সে পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে বাড়ি যাবার জন্য তার মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কত দিন আজ হয়ে গেল, সে বাড়ি যায়নি। গিয়েছিল সেই উনিশ-শো বাহান্ন সালে, পাসপোর্ট ভিসা প্রথা চালু হবার ঠিক আগে দিয়ে; তাও তো তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হল, পাছে বর্ডার বন্ধ হয়ে যায়। মা, ভাই ভাবীকে দেখা হয়নি, সে আজ কত দিন। বাচ্চা আপ্পে আম্মাও নিশ্চয়ই এ কয় বছরে কথা বলা শিখে গিয়েছে। তার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল—একটা পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত আজ কালের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। আবদুর রহমানের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায়। তার পাসপোর্ট ভিসা সব আছে। সে ঠিক বলতে পারবে পাস-পোর্ট ভিসা সংগ্রহের জন্যে কি কি করতে হবে, না হবে। কারখানা থেকে বের হয়ে অবধি সেই জন্যে বাসু গরু খোঁজা করে খুঁজে বেড়াচ্ছে আবদুর রহমানকে। কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না। মেস্, কোয়ার্টার, ইউনিয়ন অফিস যেখানে যাচ্ছে, শুনছে, রহমান সাহেব এই একটুখানি আগে এসেছিলেন। মায়, মুরারীর পানের

দোকান আর ইসাকের চায়ের দোকানেও কয়েক দফায় বাসু তার খোঁজ করল, কিন্তু আবহুর রহমান আজ একেবারেই লা-পাত্তা।

রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ বাসুর চোখে কিছুতেই ঘুম এল না। সে শুধুই বালিশটা তালগোল পাকিয়ে মাথার তলায় দিয়ে, ঘুমের চেষ্টায় বৃথাই এপাশ ওপাশ করতে লাগল। না, আর সে খামোখা দেরি করবে না। এবার দেশে গিয়েই সে বিয়ে করে ফেলবে। কোকনদ বন্দরে একটা সিগার কারখানায় কাজ করে তাদেরই গ্রামের একটি ছেলে কমরুদ্দিন্। সেই কমরুদ্দিনের বোন আয়েষা নিশ্চয়ই এতদিনে বিয়ের বয়স ছাপিয়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে দেখা কেবল ডাগর হয়ে ওঠা আয়েষার সুশ্রী টল্‌টলে চেহারাটির ছবি কোনওদিনই বাসুর মন থেকে মুছে যায়নি। সেই আয়েষাকেই সে একান্তভাবে কামনা করে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে হতাশায় ভেঙে পড়ে, যদি এতদিনে আয়েষার অন্য কোথাও বিয়ে সাদী হয়ে গিয়ে থাকে? তাছাড়াও প্রশ্ন আছে। বিয়ে করে আয়েষাকে তো এ ভাবে সে এতদূরে ফেলে রাখতে পারবে না। কিন্তু এখানে এনেই বা তুলবে কোথায়? এখানে আসার পর এত বছর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তার আলাদা একটা কোয়ার্টার মিলল না। একটা রান্নাঘর আর একখানা মাঝারি সাইজের থাকবার ঘর সমেত উনিশ টাকা ভাড়ার এই বাসাতে তার মতো আরো চার পাঁচ জন দুর্ভাগার সাথে এক সঙ্গে সে এখানেই গাদাগাদি করে থাকে। সুবিধে মতো আলাদা বাসা ভাড়া পাওয়াও তো এখানে বহু চেষ্টা ও সময়সাপেক্ষ।

• আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে ক্লান্ত বাসুর চোখের পাতা ভারি হয়ে বুজে এল। তার মনে হল, কলকাতায় কোনও এক ফুলের দোকানের সম্মুখে সে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আয়েষা। আয়েষা কতগুলো সাদা সুগন্ধি ফুল কিনে খোপায় গুঁজে নিল। তারপরে তারা দুইজনে একখানা ট্যাক্সিতে করে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুল। হুইসিল্ দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছিল মাদ্রাজ মেল। দৌড়াদৌড়ি করে তাতেই তারা চেপে বসল। আর একটু হলেই গাড়ি ফেল্ হত তার কি! ঈষৎ হেসে আয়েষা হাঁপাতে লাগল। পদ্মপাতায় টলমল করা জলের মত, পপ্লিনের আবরণে তার সুডৌল বুকখানা যেন হাপরের মত ওঠানামা করছিল। শিশির বিন্দুর মত কয়েক ফোঁটা ঘামও দেখা দিয়েছে আয়েষার কপালে। প্রশান্ত মুখে এগিয়ে এসে বাসু পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে অতি নির্লিপ্তভাবে মুছিয়ে দিল আয়েষার কপালের ঘাম। সেই স্পর্শে পরম তৃপ্তিতে আয়েষার চোখ দুটো বুজে এল।

ট্রেন চলল। চল্ল ট্রেন খড়গপুর ছাড়িয়ে। যেতে যেতে এক সময়ে তাদের গাড়িখানা গিয়ে ঢুকল উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে। ছাড়ল সুবর্ণরেখা, ছাড়ল মহানদী। চিল্কা হ্রদের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে গঞ্জাম জেলার সীমানা ছাড়িয়ে অবশেষে তারা ঢুকল গিয়ে অনধ্র প্রদেশের ভাইজাগ জেলায়। ওয়াল্টেয়ারে গাড়ি থামতেই তারা কিনল কয়েকটা নারেঙ্গী, কিছু কলা আর ডাব। অতীত স্মৃতির পুলকে পুলকে শিহরণ বোধ করলো বাসু।

বুঝলে আয়েষা······বাসু বললে,—এই ওয়াল্‌টেয়ার থেকে শাট্‌ল্‌ ট্রেন ধরে ইচ্ছে করলেই আমরা পৌছে যেতে পারি ভাইজাগ পোর্টে। ওখানে কাজ করে আমাদেরই গ্রামের রাজু. রত্নম্‌। ওদের সাথে বেশ স্বচ্ছন্দে একদিন থাকা যাবে। ওরা কি কখনও আমাকে ভুলতে পাবে? এক সাথে, এই ভাইজাগেই আমাদের প্রথম কর্মজীবনের শুরু। একসাথে আমরা ইনটারভিউ দিই, একসাথেই জয়েন করি চাকুরিতে।

শুনতে শুনতে আয়েষা নম্রভাবে একটু হাসল। এ সব ব্যাপার কোনোটাই তার না জানবার কথা নয়। তব্‌ শুনতে আয়েষার বোধ হয় ভালই লাগছে। গাড়ি কিন্তু ততক্ষণে ওয়াল্‌টেয়ার ছেড়ে এসেছে বহু আগে। এসে থেমেছে শামলকোট জংসনে।

খাবে আয়েষা, কফি খাবে?

খাও,······আয়েষার আপত্তি নেই।

দুজনে দু গেলাশ কফি হাতে করে নিল। আয়েষা কফিতে এক চুমুক দিয়ে ফের মৃদু মৃদু হাসছে, কি যেন বলি বলি করেও বলছে না। ও, বোঝা গেছে, বোধ হয় তার ইচ্ছে, এখানে নেমে শাট্‌ল ধরে একবার ককনাডা পোর্টে যায় কমরু ভাইকে দেখবার জন্যে। যাবে কি? নেমে পোর্টে যাবার শাট্‌ল অবশ্য ধরবার এখনও সময় আছে। ডিজেল্‌ এঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখনও ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌ করছে।

—কিন্তু, থাক্‌ না আয়েষা!······বাসুর কণ্ঠে মিনতির সুর,—চল, আগে বাড়ি যাই। কত দিন আপন গ্রামখানা যে দেখিনি!

—বেশ তাই চলো।........আয়েষার সম্মতি আছে। আয়েষা স্বামীর অনুরোধ কি উপেক্ষা করতে পারে কখনও ?

আর মাত্র কয়েকটা স্টেশন বাদেই তারা নেমে পড়বে। বেশ ভাল শক্ত সমর্থ গরু দেখে একটা ঝেড্‌কা তারা ভাড়া করে নেবে। ট্রেনখানা হু হু করে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু একি ? একি ? গাড়ি তো তাদের স্টেশনে থামল না। ব্যতিব্যস্ত বাসু জানালা দিয়ে উদ্বিগ্নভাবে মুখ বাড়িয়ে দিল। হা হুতাশ শুনে গাড়ির অন্যান্য প্যাসেঞ্জারেরা বিরক্তির সাথে তার দিকে তাকাল —তুমি কোথাকার লোক হে বাপু ?

—কেন ? আমি তো এই দেশেরই লোক। এই তো আমার জন্মভূমি !........অস্বাভাবিক একটা জিদের সাথে স্বতস্ফূর্ত তৎপরতায় বাসু কথাটা বলে ফেলল। অপমানের গ্লানিতে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কানের ভেতরটা তার ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলে যাচ্ছিল তখন। এ যেন একনিষ্ঠ ভাবে আকাঙ্খিত আপন মানসীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুর মর্মান্তিক আঘাত।

গাড়ির সমস্তগুলো লোক অবাক হয়ে তার দিকে চাইল। —কেন ? কেন, তোমরা আমাকে অমনি করে বল্‌লে ?........ ছেলে মানুষের মত অভিমানে বাসুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

—বলবে না ? বলবেই তো...মাথা ঝাঁকিয়ে একজন বুড়ো মানুষ জবাব দিল—জানো না, এটা মাদ্রাজ মেল ? রাজমহেন্দ্রার আগে আর কোথাও থামবে না।

—এ্যাঁ, তাই নাকি ? ও, হাঁ, তাই তো !........বাসুর কান্না

পেল—বহুদূরে পূর্ব পাকিস্তানে থাকি আমি……অপরাধীর মত মাথা নিচু করে আম্‌তা আম্‌তা করে বললে বাসু—এখানকার অনেক কিছুই যে আমি ভুলে গিয়েছি।

গাড়িখানা ততক্ষণে গোদাবরী ব্রীজের উপরে চড়েছে। বাসুর চোখ দুটো স্নিগ্ধ হয়ে যেন জুড়িয়ে এল, আঃ, এই সেই বিপুল সলিলা বিশাল বক্ষ গোদাবরী! হৃদয়ের সমস্ত বেদনা-রাশি যেন তার ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল।

কিন্তু, পাশের বাড়ির মুরগির ডাকে হঠাৎ ঘুমটা এমন সময়ে তার ভেঙে গেল। দারুণ অবসাদে বাসু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সূর্য তখনও ওঠেনি, কিন্তু রাত ভোর হয়ে গেছে।

রবিবার দিন রেলওয়ে শহরটির চেহারা যেন একদম পালটিয়ে যায়। ভোরবেলায়, কারখানার বাঁশিটি আজ ভোঁ করে বেজে ওঠেনি। সারা দিনরাতেও বাঁশিটি আজ একবারের জন্যেও কাউকে হাঁকডাক করবে না। হাজার হাজার মজুর সকাল বেলায় কেউ আর আজ কারখানায় যায়নি। আজ এরা অনেকেই বেলা করে ঘুম থেকে উঠবে। যুবকেরা আজ আসর জমাবে চায়ের স্টলগুলিতে; অহেতুক হল্লা করবে রাস্তায় রাস্তায়, সিনেমা হলের সামনে গিয়ে ভিড় জমাবে; অভিনেতা অভিনেত্রী-দের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বাজি রেখে ঝগড়াঝাটি হবে কোনও কোনও আড্ডায়; কোথাও বা হাতাহাতি করে ফেলবে

তারা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কের পরিণতি হিসেবে। বেশি বয়সী যারা, তারা সমস্ত বাজারটা ঘুরে ঘুরে কেনা কাটা করবে। কোথায় লাকড়িগুলো একটু শুকনো পাওয়া যাবে, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে রেশন্‌শপের পুরানো বিস্বাদ গমের বদলে দু চার পয়সা বেশি ব্যয়ে টাটকা গম। কোথায় পাবে একটুখানি ভাল গোস্ত্। এই চিন্তায় তারা কম পীড়িত নয়। পয়সায় কুলোয় না বলে, যিনি রেশনশপ থেকে বেশি দরে চিনি নেওয়া বন্ধ করেছেন, তিনি শস্তায় একটু পরিষ্কার দেখে গুড়ের আশায় রোদ মাথায় করে পাঁচ দোকানে ঘোরাঘুরি করবেন। মিষ্টি না হলে, ছেলেমেয়েরা শুকনো রুটিগুলো গিলতে চায় না; গুড় অপরিষ্কার হলে, বুড়ো বয়সে শুনতে হয় গৃহিণীর মুরুব্বিয়ানা চেটাং চেটাং কথা। ঝামেলা কি সংসারে এক রকমের? হাজারো রকমের। আর এ হাজার রকমের ঝামেলা-গুলি যেন এ কয়দিন দাঁত কপাটি মেরে থেকে হঠাৎ আজ সুড়-সুড় করে রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড়েছে মন-উচাটন আরশুলার ঝাঁকের মতো।

সাড়ে সাতটা বাজে। দাড়িটা ভাল করে কামিয়ে নিয়ে, তেঁতুলের রসে সিক্ত পেঁয়াজের খানিকটা সালাদ্ মাখিয়ে দু' খানা রুটি চিবিয়ে, ঢক্-ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে বাসা থেকে বের হয়ে পড়ল বাসু। আঁকা বাঁকা পায়ে হাঁটা পথে মহল্লাটা পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠতে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগে গেল তার। একটুখানি বিরক্তই বোধ করল বাসু। পথগুলি এত সরু যে মনে হয় যেন

স্বভাবকৃপণ একটা লোকের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সৃষ্টি হয়েছে। সেই কৃপণটার হিসেবের কড়াকড়ি ফাঁকি দিয়ে যদি বা কোথাও পথটা একটুখানি শিথিল হয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে, অমনি সেখানে গিয়ে পড়েছে মহল্লার বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোর অব্যর্থ নজর। সেখানেই তারা পরম আনন্দে বসিয়েছে লাট্টু আর মারবেলের আখ্ড়া। রবিবারে স্কুল যদিও খোলাই থাকে, তবুও কেন যেন বাউণ্ডুলে ছেলেদের নিত্যকার খেলার আখড়ায় খেলুড়ের সংখ্যা ফেঁপে গিয়েছে আজ পড়ুয়াদের অংশ গ্রহণে। ওদের ভিড় ঠেলে, মহল্লাটা পার হয়ে যখন বড় রাস্তাটায় উঠল, বাঁ দিকে মোড় ঘুরেই বাসু দেখে সম্মুখে অচল অবস্থার এক আদর্শ নমুনা। সামনেই একটা কালভার্ট। কালভার্টের ওপার থেকে আসছে সারি সারি তিনখানা বাঁশ বোঝাই মোষের গড়ি। প্রথম গাড়িখানা কালভার্টের উপরে চড়ে গিয়েছে। আর তার মত এপার থেকে ওপার যেতে যারা ইচ্ছুক, তাদের মধ্যে অগ্রবর্তীরা হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত একদল সিনেমার হ্যাণ্ডবিলওয়ালা ; সঙ্গে তাদের ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ ড্রাম সাইড-ড্রামের বহর। আর রয়েছে চাকায় টানা মানুষ-প্রমাণ একখানা পোস্টার। বাসু সামান্য একটু দাঁড়িয়ে সমগ্র অবস্থাটা একবার পরিমাপ করে নিল। ব্যাণ্ড-পার্টিওয়ালাদের সাথে তার ভাগ্য জড়িয়ে ফেলা সে সমীচীন মনে করল না। বেঁটে মানুষের এই এক সুবিধা আছে, সে ডাইনে বাঁয়ে সামনে নিয়ে ড্রাম সাইড-ড্রামের বহরটা ভেদ করে কালভার্ট পর্যন্ত এগিয়ে গেল। তার পর খুব

কৌশলের সাথে, বাঁশের খোঁচা শিঙের গুঁতো আর কাদা গোবর মাখা জানোয়ারটার লেজের ঝাপটা এড়িয়ে আগে বের হয়ে গেল।

মুরারীর বনেদী চা'লের দোকান, রবিবারে বেলা সাড়ে আটটা ন'টার আগে কখনই খোলে না। কাজেই বাসু সেদিকে গেল না। সে রওনা হল খাস বাজারের দিকে ইসাকের চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে। ইসাকের বাড়ি মুঙ্গের জেলার সেখপুরায়। আর, ঠিক তার দোকানের পাশেই হচ্ছে ছাপড়া জেলার নুর মহম্মদের পান বিড়ির দোকান। বিভাগ পূর্ব কালে নুরমহম্মদের দোকান ছিল কাঁচড়াপাড়ায়। সেখান থেকে সে এখানে এসেছে। কাজেই বেশ কিছু সংখ্যক জামালপুর আর কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ থেকে আসা স্টাফ্ এখানেই চা খেতে জুটে যায়। ইউনিয়নের নেতারা কেউ কেউ কাগজপত্র বগলদাবা করে সময়ে সময়ে এখানেই এসে বসেন বলে, কাজে অকাজে লিলুয়া আর খড়গ্‌পুরীয়া মজুরও যে কিছু কিছু এখানে এসে আড্ডা জমায় না, তা নয়। প্রবীণ ইউনিয়ন নেতা লতিফ সাহেবের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায় প্রায় আরাকান সীমান্তে। কিছুকাল আগে পাহাড়তলী থেকে তিনি এখানে বদ্‌লি হয়ে এসেছেন। তিনি আসার পর থেকে ঢাকা, নোয়াখালি, চাটগাঁর লোকও অনেকে এসে ভিড় জমিয়ে থাকেন। চায়ের দোকানের অভাব এ শহরে মোটেই নেই। কিন্তু ইসাকের চায়ের দোকানের সুস্পষ্ট ভাবে একটা আলাদা ধরনের আভিজাত্য আছে।

এখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে উঠতে কখনও কখনও তা সূক্ষ্ম সাহিত্যিক বা দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হয়ে যায়। হয়তো তখন কথায় কথায়, মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন মনীষী ইবন খালেদুনের দার্শনিক মতবাদের মূল্য নিরূপণের অবতারণা হয়, অথবা হয়তো অবতারণা হয় দেশ-প্রেমিক সাহিত্যে ইকবাল আর রবীন্দ্রনাথের অবদানের তুলনামূলক বিচার প্রসঙ্গে। এ সব আলোচনা চলতে চলতে ছোট মুখে বড় কথাও যে সময়ে সময়ে না হয়ে যায় তা নয়। সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে স্থূল তর্ক বিতর্কও হয় কখনও কখনও। মুন্সীগঞ্জের শওকৎ আলি, হঠাৎ হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেবিলে বিরাট এক চাপড় দিয়ে পালামৌ জেলার আবদুর রৌফ্‌কে চ্যালেঞ্জ করে বসে—লাহোর থিকা পাট্‌না পর্যন্ত লাঙল দিয়া একবার চইষা ফালাইয়া দাও তো মিয়া! দ্যাহো তো পারবা নি কি একটা রামমোহন, একটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুর কিংবা নজরুল একটা বাইর করতে?

জবাব দিতে গিয়ে উত্তেজনায় আবদুর রৌফের তোৎলামিটা বেড়ে যায়—ভিদ্যিয়া সা-সা-সাগর চন্দর ঔর রা-রা-রাম মনোহর হমার নাই। লেকিন, লে-লিকিন·······

বেশাক্‌!·······আখতার হয়তো এগিয়ে এসে একখানা হাত মোলায়েম ভাবে শওকৎ আলির কাঁধের উপরে রাখল—ঠিক আছে। লেকিন·······মৃদু হেসে, দু আঙুলে ছোট্ট এক টিপ,

নস্যি নিয়েছে এরকম একটা মুদ্রার ভঙ্গিতে সূক্ষ্মতার পরিমাপ দেখিয়ে, খুব আন্তরিকতার সাথে মিঠে করে সে বললে— আমীর খসরু, গালিব, ইকবাল, ই সব ছোড় দো। লেকিন, তামাম বাংলা লিট্‌রেচার তাল্লাস করিয়ে হমাকে সির্ফ একটা প্রেম চন্দ্‌ বাহির করিয়ে দিতে হোবে।

প্রেমচন্দের সাহিত্যের সাথে পরিচয় শওকত আলির হয়তো আজও তেমন ঘটে ওঠেনি, কিন্তু তবুও সে পরম বিজ্ঞের মতো বিনয়সূচক ভঙ্গিতে মাথা চুলকাতে থাকে।

—জ-জবাব দো······বিজয়ীর ভঙ্গিতে আবদুর রৌফ্‌ এবার তাকায়।

কিন্তু আখতার আপোসের ভঙ্গিতে বলে—বুলবুলের কাছে গুলাব ঔর চামেলী এক সমান আছে·······সে গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে ওঠে—গুলাব্‌ কি বাহার সে যব্‌ খুশ্‌ হ্যাঁয়, না-খোশ কেঁও হোঙ্গে চামেলী কি খুশ্‌বু সে?

গানটা আখ্‌তারের স্বরচিত। উর্দু বাংলা ভাই ভাই শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সে এটা লিখেছিল। সে যাহোক, কিন্তু সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে স্থূল তর্ক বিতর্কের সেদিন হয়তো এমনি ভাবেই একটা স্থূল মীমাংসা হয়ে যায়।

ইসাকের চায়ের দোকানের আসর যাদের না হলে তেমনটা জমে না, আবদুর রহমান তাদের অন্যতম। আর রবিবারে তো নিশ্চয় সে একবার অন্তত আসবেই। সুতরাং আবদুর রহমানকে যদি অব্যর্থভাবে পাকড়াও করতে হয় তবে সাত জায়গায়

দৌড়াদৌড়ি না করে বাসুর পক্ষে ইসাকের দোকানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকাই ভাল।

বাসু যখন গিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকল, তখন সবাই না এলেও, রবিবারের মেহ্‌মানরা অনেকেই ইতিমধ্যে সেখানে এসে জমেছেন। কিন্তু আজ এদের হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিযন্ত্রে ঝঙ্কারের সূক্ষ্ম তারগুলি যেন সম্পূর্ণ অন্য এক সুরে বাঁধা। শরতের নীল আকাশটা দেখা দেবার পরে আজই প্রথম রবিবার। রবিবারের ভোরের ঢিলে মেজাজে শিশিরে ভেজা সবুজ ঘাসের স্নিগ্ধ সুষমা অনেকের মনেই জাগিয়ে তুলেছে পেছনে ফেলে আসা সমস্ত শরৎকালগুলো মিলেমিশে যেন একসাথে গেঁথে-যাওয়া ঘনীভূত মধুর একটা স্মৃতি। রোদে ধরেছে সোনার রং। সেই রং সকলের মনেই ছুঁয়ে গেছে, ধরিয়ে দিয়েছে রঙীন নেশার একটা আমেজ। ঋতুর এই নব নব রূপ পরিবর্তনের মধ্যে কি যে এক যাদুময় কারিগরি রয়েছে যে দুনিয়ার সবচেয়ে ভোঁতা মানুষটিও বোধ করি এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। আজকের মজলিশে তাই যেখান থেকে যে ভঙ্গি নিয়ে যত মোটা কথার লহরই উঠুক না কেন, ঝংকৃত হয়ে উঠেছে শুধুই সূক্ষ্ম একটি সুর। কোনও মানে না থাকলেও, পুরানো স্মৃতির জাবর কাটতেই যেন আজ সবচেয়ে মিঠে লাগছে।

আখতার গুন্‌ গুন্‌ করে গান ধরেছিল। অভ্যস্ত কানে ভৈরবীর ঠুম্‌রীর ধুন টের পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। চায়ের কাপে চিনি দিয়ে চামচে নেড়ে সেটা মিশিয়ে দিচ্ছিল ইসাক। চামচে আর গ্লাশে ঠোকাঠুকি লেগে টুং টাং করে

শব্দ হচ্ছিল। তালে তাল মিলে যেতেই, ইসাকের মুখ দিয়ে কেমন করে যেন বের হয়ে গেল—ওহো, ওহো!

আবদুর রৌফও সঙ্গীত রসিক লোক। বাড়ি পালামৌ জেলাতে হলেও, তাদের গ্রামের এলাকাটা গয়া জেলারই লাগা। গয়ার কে এক জানকী বাঈয়ের নাম করে সে বললে—গা-গানে-ওয়ালী কই হেঁ তো উয়ে জা-জা-জান্‌কী বাঈ।

কথাবার্তা যে খুব ছোট গলায় হচ্ছিল না তা বলাই বাহুল্য। ইসাকের দোকানের সামনেই হচ্ছে সেখ হানিফের তামাকু জর্দা কিমামের দোকান। সেখ হানিফ এসেছে বেনারস থেকে। সে নিজ দোকানে বসেই সুগন্ধি জর্দার একটা বয়ম ঝেড়ে পুঁছে স্বস্থানে রাখতে রাখতে প্রতিবাদের ছলে বললে—ঠুমরী মে বনারস। ঔর বনারসী ঠুমরীওয়ালী কই হেঁ তো উয়ে বড়ে মতি বাঈ।

পেশোয়ারী ফলওয়ালা হায়াৎ খাঁ ঠিক আসরের একজন না হলেও ইসাকের বাঁধা খদ্দের সে। হায়াৎ খাঁ দোকানে ঢুকতে ঢুকতে নোয়াখালির আসগর মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে—দেকো ভাইয়া, মেওয়া আর গানা, এ দোনো মে হমার পেশোয়ার। লেকিন, বঙ্গাল মুলুক্‌-এ বসে ওর সোয়াদ মিলবে না।···খাঁ সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে একটুখানি চোখ বুজল। তারপরে, সমস্ত পথটা যেন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, এমনি ভাবেই বলতে আরম্ভ করল—যাও কলকাত্তা, তব চলো হাওড়া। চাপো গাড়ি। অব্‌ সিধা চলো দিল্লী···লাহোর···রাওলপিণ্ডি, তব পেশোয়ার। ব্যস্‌, উতরো!······মস্ত একটা পাগড়ির

নিচে সুর্মা মাখা খুদে খুদে চোখ দুটো তার উল্লাসে বিস্ফারিত হয়ে খুলে গেল—অব খাও আপেল, আঙুর, আখরোট, কিসমিস, খোবানি, আঃ কি সোয়াদ ! সুনো গানা, একটা ফকির যে গানা গাবে, সুনে তুমার দিল দিওয়ানা হোয়ে যাবে।

হায়াৎ খাঁর মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে সত্যিই যেন সে পেশোয়ারের বাজারের মোড়ে কোনও এক ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পরম আহ্লাদে আঙুর চুষতে চুষতে কোনও পুশ্‌তু গান শুনছে।

বাসু মশ্‌গুল হয়ে খাঁ সাহেবের গল্পটা শুনছিল। কথাটা বোধ হয় ঠিকই। ফল আর গান—এদুটো যে কত মধুর, তা আপন আপন দেশেই শুধু উপলব্ধি করা যায়। বাসু ভাবলে, সে বলে, চলো না অক্রে ! চক্রকেলী কলা দেবো খেতে। টেরই পাবে না তুমি, কোথা দিয়ে এক কান্দি কলা ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। তারপরে খাও একটা ডাব, সমস্ত মন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। এর পরে ধীরে সুস্থে বসে শোনো পারুপল্লী রামকৃষ্ণায়ার গান। রেডিওতে নয় ! আমার দেশে গিয়ে শুনতে হবে। মৃদঙ্গের সাথে সেই গান। কি যে অপূর্ব ! রামকৃষ্ণায়ার গান ঘটনাক্রমে শুনেছিল বাসু পীঠাপুরম রাজবাড়িতে। কিন্তু কথাগুলো তার যুতসই ভাবে জিভের ডগায় যোগাতে না যোগাতেই পাশের দোকান থেকে পানবিড়িওয়ালা নুর মহম্মদ প্রবল উৎসাহে আসরে এসে যোগ দিল—গানা মে কাজরী, ঔর গানেওয়ালী কই হেঁ তো উহে মীর্জাপুরওয়ালী ঔরতিয়াঁ......একটুখানি নাচের ভঙ্গি দিয়ে কাজরীর ধুনে সে গেয়ে উঠল—সের ভর সাতুয়া

লৈ কে বেনারস যৈ বৈ হো ! মীর্জাপুর বৈঠকরকে কাজরীয়া গায়বৈ হো !

সকলেই মজে গিয়ে মুখর হয়ে উঠল, ওহো ওহো !

কিন্তু এই গোলাপী নেশায় মস্ত্ হয়ে থাকবার সুখটুকু বেশি-ক্ষণ আর ভোগ করা গেল না। লতিফ সাহেব একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘরে ঢুকলেন—আসামে ডিব্রুসাদিয়া সীমান্তে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক এলাকা জুড়িয়া প্রবল বর্ষণ…

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল, অর্থাৎ এর পরিণামটা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে লাগল। নুরমহম্মদ জিজ্ঞাসাই করে বসল—মশ্রিকী পাকিস্তানের কছু খত্রা হোবে কি ?

—হবে না ? বল কি ?………লতিফ সাহেব খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে পেতে রাখতে গিয়ে একটা কাপ উলটে ফেললেন। দু'তিন জন এগিয়ে এসে চায়ের কাপ সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলল। ভাঁজ খুলে কাগজখানা ওরা বড় করে টেবিলের উপরে পেতে মেলে ধরল। নখের আঁচড় কেটে কেটে লতিফ সাহেব দেখিয়ে বললেন—এই হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, আর এই হচ্ছে গিয়ে মেঘনা আর এই হচ্ছে কর্ণফুলি।

অনেকেই কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লতিফ সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন—যে সব এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে বলে কাগজে লিখছে তাতে দু একদিনের মধ্যে ঐ সমস্ত নদীগুলি দিয়ে পানি নামতে শুরু করবে। মায়, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীতেও হয়তো পানির বাঢ় দেখা দেবে।

ঘটনাটির তাৎপর্য বুঝতে নোয়াখালির আখতার মিয়ার বিন্দুমাত্র দেরি হল না। অর্থাৎ সমস্ত পূর্বাঞ্চল জুড়ে দেশময় আবার এক দফা প্লাবনের আশঙ্কা।

সওকৎ আলি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এইবার বিমর্ষ বদনে বলল—চুয়ান্ন সালের ফ্লাডে তো গান কইরা, নাইচা কুঁইদা, পাবলিকের কাছ থিকা ভিকা সিক্কা কইরা, নিজেরাও কিছুমিছু দিয়া, হাজার বার শ' টাকা রিলিফ পাঠান হইছিলো। অহন্ কি আর পারা যাইবো? মাইনষের যে অবস্থা।

মনে হল না লতিফ সাহেবের কানে সে কথা গিয়েছে। তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা, বললেন—দেখো তো কি মুশ্‌কিলের কথা। সেবার বন্যার সময়ে নেওয়া কর্জের টাকাটা আজও রেলকর্তাদেরকে কিস্তিতে কিস্তিতে মাইনে থেকে কেটে আমাদের শোধ দিতে হচ্ছে। এর পরে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত নয়া মুসিবত্ যদি একটা আসে······হঠাৎ কি একটা আশু কাজের বিষয় মনে পড়ে যাওয়ায়, কথাটা অসমাপ্ত রেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আবদুর রহমান আসে নি এখনও?

—আব্‌দর্ রম্মান কা পাত্তা কালসে নেই মিলতা····জবাবটা দিল বাসু।

—ইউনিয়ন আফিসের চাবিটা?·······আবার জিজ্ঞাসা করলেন লতিফ সাহেব।

—আবদুর রহমান কা পাস·······আখতার বললে।

—চলো তো। চলো তো ওর ওখানে। চাবিটা নিতে হবে। তাছাড়া, ওর সাথে কাজও আছে একটু।

অনেকটা এক গুঁতোয় অমন জমে ওঠা মজলিশটা ভেঙে দিয়ে, বাসু আর আসগর মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আবদুর রহমানের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন লতিফ সাহেব।

আবদুর রহমানের সেদিন তখনও বাসা থেকে বের হওয়া হয়ে ওঠেনি। গত সপ্তাহেই মনিঅর্ডারটা করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু করা হয়নি। সুতরাং আর গাফিলতি করা চলতেই পারে না। আজকেই ফরমটা লিখে টিখে সব ঠিক্‌ঠাক্ করে রাখতে হবে। না হলে, কাল সোমবার, অত সময় পাওয়া যাবে না! সে চৌকির উপরে ঝুঁকে পড়ে বসে বসে, ফরমে পরিষ্কার করে প্রাপকের ঠিকানাটা লিখল ঃ

শ্রীযুক্তা শান্তিময়ী দত্ত। দত্তপাড়া।

পোঃ বালিয়াকান্দী। জেলা ফরিদপুর।

কয়েক লাইন চিঠি, কুপনের অপরিসর জায়গাটুকুর মধ্যে সে আগেই লিখে রেখেছিল। এবারে, গতকাল বহু জায়গায় ঘুরে সারাদিনমানের অক্লান্ত চেষ্টায় সংগ্রহ কবা, বৈরাম পাণ্ডার মিষ্টির দোকানের হালখাতার নিমন্ত্রণের পুরানো একখানা চিঠি অতি সন্তর্পণে সে বালিশের তলা থেকে বের করল। তারপরে, সেটা দেখে দেখে, কুপনে চিঠির পাঠ হিসেবে জুড়ে দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে নকল করে সে লিখল ঃ সবিনয় নিবেদন। নিমন্ত্রণ পত্রে যখন এই পাঠটা ব্যবহার করা হয়েছে তখন নিশ্চয় এই পাঠটা পুরুষ মহিলা ছোট বড় সকলের

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবদুর রহমান তাই অতি নিষ্ঠার সাথে কথা দুটি লিখে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বড় বড় করে বলল—এইবার ঠিক হয়েছে !

—কি ঠিক হল আবদুর রহমান ? অঙ্ক কষছ বলে মনে হচ্ছে······হাসতে হাসতে সদলবলে লতিফ সাহেব আবদুর রহমানের সম্পূর্ণভাবে মহিলা-বিবর্জিত আস্তানাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

—না, কিছু না······আবদুর রহমান একটু লজ্জিত হল। স্তূপীকৃত কাগজপত্র সরিয়ে সে চৌকির উপরে ওদের বসবার জায়গা করে দিচ্ছিল !

—না আবার কি হে ?·······বসতে বসতে ঠিকানাটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে লতিফ সাহেব বললেন—ইনি আবার তোমার কে হলেন ?

—হবেন আবার কে ? তবে, বন্ধুলোক তো বলা যায় বটেই·······আবদুর রহমান পকেটে পেনটা রাখতে রাখতে বললে।

—বন্ধু ?······লতিফ সাহেব আরো অবাক হয়ে উৎসুক ভাবে কুপনটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পড়লেন। লেখা আছে ঃ সবিনয় নিবেদন, পঁয়ত্রিশটি টাকা পাঠাইলাম। টাকা পাইবা মাত্র, বাগ্‌নানের ঠিকানায় অনিলবাবুকে প্রাপ্তি সংবাদ জানাইবেন। আপনাদের নিকট হইতে প্রাপ্তি সংবাদ যথাসময়ে না পৌঁছিলে, আমার পিতা অনিলবাবুর নিকট হইতে টাকা লইতে বিব্রত বোধ করেন। ইতি আবদুর রহমান।

আসগর মিয়া শুনে কৌতুক বোধ করে বললেন—বুদ্ধিটা তো' বালোই অইছে।

—তা হলে, আপনি এখানে টাকা পাঠিয়ে অনিলবাবুর সংসার চালিয়ে থাকেন। আর, ওখানে অনিলবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপনার বাবা সংসার চালাচ্ছেন?……সমস্ত প্রক্রিয়াটা সম্ঝে নেবার ভঙ্গিতে লতিফ সাহেব কথাটা বললেন।

—তা ছাড়া উপায়?……..আবদুর রহমান ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললে—হিন্দুস্তান পাকিস্তান মনি অর্ডার বন্ধ হওয়ায়, প্রথম দিকে বাপজানের বড়ই কষ্ট হয়েছিল। ভাগ্যে এই ভদ্রলোক মেদিনীপুর থেকে আমাদের হাওড়ার বাগনানে বদলি হয়ে এলেন, তবে না রক্ষে। ব্যবস্থাটা অবশ্য বাপজানই ঠিক করেছেন।

বাসু বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিল না। সে শুধু উসখুস করছিলো। সুযোগ খুঁজছিল কখন সে সুবিধাজনক ভাবে পাসপোর্ট ভিসা সংক্রান্ত আলোচনাটার অবতারণা করতে পারবে।

লতিফ সাহেব কেন জানি খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আবদুর রহমান জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা লতিফ সাহেব, এই বালিয়াকান্দীটা ফরিদপুরের কোথায় বলতে পারেন? মনি অর্ডার পৌঁছতে ক'দিন লেগে যাবে?

—বালিয়াকান্দীতে বহুকাল আগে ছিলাম আমি কিছুদিন… গলাটা খাঁকারি দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে লতিফ সাহেব বললেন—আমার দুলাভাই ওখানে চাকুরি করতেন।

তিনি যেন তাঁর বহু পুরানো স্মৃতি মন্থন করে আস্তে আস্তে বলে গেলেন,—পোড়াদহ জংশন থেকে যদি ধর তবে যেতে হবে গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। গোটা কয়েক স্টেশন বাদে কালুখালি জংশন। কালুখালি থেকে মধুখালির দিকে যে লাইন বের হয়েছে, ঐ লাইন ধরে এগিয়ে যেতে হবে। বোধ করি, গোটা দুই স্টেশন বাদেই আড়কান্দী স্টেশন। আড়কান্দী থেকে মাইল তিন চার পথ পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে করে যেতে পারা যায় বালিয়াকান্দী গ্রামে। ছোট্ট একটা নদী গিয়েছে তার পাশ দিয়ে। নদীর নাম চন্দনা। নদীর ধার দিয়ে আছে অনেকগুলি হিন্দুপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অবশ্য এখন সে গ্রামগুলির অবস্থা কেমন জানি না। দেশ বিভাগের পর বহু এ রকম বর্ধিষ্ণু গ্রাম তো একেবারেই জনহীন হয়ে গেছে! ঐ খাঁ খাঁ করা জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামগুলি দেখলে বুকের ভেতরটা ছ্যাত্ করে ওঠে বুঝলে? ঐ গ্রামগুলি তো আমারই দেশের……লতিফ সাহেবের গলাটা ভারি হয়ে ধরে এল। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে মনে হওয়ায় হঠাৎ তিনি প্রসঙ্গটা বদলিয়ে দিয়ে বললেন—তা টাকা পৌঁছুতে তো তিন চার দিন লাগবেই।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। ইউনিয়ন অফিসের চাবি আর কি কি কাগজপত্র আবদুর রহমানের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে আসগর মিয়াকে সঙ্গে করে লতিফ সাহেব বের হয়ে গেলেন।

বাসু এবার তার পাসপোর্ট ভিসা সংক্রান্ত আলোচনাটা পেশ করে বললে যে এক সপ্তাহের মধ্যেই তার দেশে

যাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আবদুর রহমান হা হা করে হেসে উঠল—এক হপ্তার মধ্যে তুই যাবি কি করে? তুই একটা পাগল! এক হপ্তার মধ্যে পাসপোর্ট ভিসার ফরম যদি পেয়ে যাস, তবেই বুঝবি তোর নসিব খুব ভাল।

দেশে যাবার জন্যে পাগল বাসুকে যথারীতি ফরম্ প্রভৃতি সংগ্রহ করবার পরামর্শ দিয়ে শান্ত করে যখন আবদুর রহমান তাকে বিদায় দিল, তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে গিয়েছে।

অনেক কয়েক মাস পরের কথা। যথাসময়ে শীত এসেছিল। সেই শীত যথাসময়ে বিদায় নিয়ে চলেও গিয়েছে। পাতা ঝরে পড়া গাছগুলো তার সাক্ষী। বেশির ভাগ গাছ আজো যেন তপস্যাক্লিষ্ট কুমারীর মত কারো প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে কোনও কোনও গাছে দু একটি করে নতুন পাতা দেখা দিয়েছে। দখিনা বাতাসও সময়ে সময়ে দু এক ঝলক এসে টেবিলের কাগজপত্র এলোমেলো ভাবে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আকাশ কুয়াসার সূক্ষ্ম ধূসর জাল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে আব একদিন দেখা গিয়েছে ধবল-গিরি আর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। পাগলা বাসু আরো পাগল হয়ে উঠেছে। তার পাসপোর্ট মিলেছে, কিন্তু ভিসা আজো মেলেনি। কবে যে মিলবে তারও কোন নিশ্চযতা নেই। আবেদন নিবেদনের বহু গুঁতোগাঁতা খেয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙছে না। বাসু হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার মন

যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। উৎসাহের তাপ থেকে বঞ্চিত শরীরখানা শিথিল হয়ে এত এলিয়ে পড়েছে যে বাসুর মনে হয় যেন সেটাকে তার বোঝার মত ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে টেনে চলতে হয়।

আবদুর রহমান ভাগ্যবান। তার পাসপোর্ট ভিসা সবই আছে। কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছে সে বাড়ি যাবে বলে। রওনা হবার আগের দিন, অপ্রত্যাশিত ভাবে বালিয়াকান্দী থেকে একখানা চিঠি এল: শ্রদ্ধেয় আবদুর রহমান সাহেব, অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় আপনাকে আমি বিরক্ত করিতেছি। আমার পুত্র শ্রীমান অনিলকে আপনারা অবশ্যই জানেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি নাবালক দৌহিত্রকে লইয়া আমি আমার দেশেই থাকিয়া গিয়াছি। এখানে স্বামীর ভিটাতেই আমি শান্তিতে মরিতে চাই। কোথাও যাইতে কিছুতেই আমার মন চাহে না। অনিলের চিঠি আমরা মাঝে মাঝে পাই। কিন্তু তাহার চিঠি দৃষ্টে মনে হয় আমাদের কোনও চিঠিই সে পায় না। চিঠিপত্র কোথায় ও কেন যে আটক হয় তাহা বুঝিতে পারি না। যাই হোক, আমার বয়স হইয়াছে। কখন চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজিতে হয়, ঠিক নাই। ছেলের সাথে দেখা হইবার জন্য আমার মন তাই বড় আকুল হইয়াছে। পাসপোর্ট ভিসার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু তাহা সত্বর পাইবার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। আপনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে বাড়ি যান। যদি ইতিমধ্যে যাইতে পারেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার ছেলেকে বলিবেন যেন সে পাসপোর্ট ভিসা

সংগ্রহ করিয়া অন্তত একটিবার দেশে আসে। আমার এই কথাটি যদি তাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন বড়ই উপকৃত হইব। ইতি শ্রীশান্তিময়ী দত্ত।

চিঠিখানা পড়ে আবতুর রহমানের বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে উঠল। আহা, আহা! নিশ্চয়ই অনিলবাবুকে খবরটা আমি পৌঁছে দেব। ভাগ্যে চিঠিখানা আজ এসেছে। কাল এলে তো আর আমি চিঠিটা পেতাম না। কিন্তু অনিলবাবু কি এত সহজে পাসপোর্ট ভিসা সংগ্রহ করতে পারবেন? বাসুর বিষণ্ণ চেহারাটা আবতুর রহমানের মনে পড়ে যায়, আর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঠিক তারই মায়ের মত একটি বৃদ্ধার ছবি যিনি ঝিঁঝিঁ ডাকা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, চন্দনা নদীর ধারে, পরিত্যক্ত একটি গ্রামের করুণ পরিবেশে, বুকফাটা কান্নায় সম্পূর্ণরূপে বোবা জীর্ণ এক কুটিরের আঙিনায় বসে সজল চোখে প্রতীক্ষা করছেন—প্রবাসী ছেলে কবে দেশে ফিরবে! ফিরে আসবে কি কোনও দিন? বুক চিরে আবতুর রহমানের একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

পরদিন স্টেশনে গাড়িতে উঠবার সময়ে প্লাটফরমে বাসুর সাথে আবতুর রহমানের দেখা হয়ে গেল।

—অব্‌দর্ রম্মান্, তুম ফরচুনেট!······কথাটা বাসু অভিনন্দনের ছলে হেসেই বলতে গিয়েছিল, কিন্তু সে ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। অন্য সময় হলে আবতুর রহমান হয়তো একটু হেসে বলতো—বাসু তুই একটা আস্ত পাগল।

কিন্তু আজ সে কিছুই বলতে পারল না। চোখ দুটো তারও যেন জলে ভরে আসছিল।

সেই দিনেরই কথা। একখানা দক্ষিণগামী গাড়ি পার্ব্বতীপুর জংশনে এসে থামতেই তস্‌বী মালা হাতে ময়লা আলখাল্লা পরা জনৈক দরবেশ গাড়িতে এসে উঠলেন। দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি সোজা চলে এলেন কামরাটির একেবারে এক কোণার দিকে এক বেঞ্চের সামনে। এতক্ষণ কারোই নজরে পড়েনি, ঐ বেঞ্চটিতে আগে থেকেই বসেছিল একতারা বগলে একজন বাউল গোছের মানুষ। স্পষ্টই বোঝা গেল যে সমগোত্রীয় বোধেই হোক বা যে কারণেই হোক, দরবেশ সাহেব বাউলের পাশে বসাটাই স্বাচ্ছন্দ্যজনক বলে স্থির করেছেন। বাউল অভ্যর্থনাসূচক ভঙ্গিতে একটুখানি হেসে ঝোলাঝুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা করে দিল। আঘাত লেগে একতারাটা টুং টাং করে বেজে উঠলো। দরবেশ সাহেব বসতে বসতে স্মিত ভাবে হাসলেন।

—দরবেশ সাহেবের কোথায় যাওয়া হবে?·········যথেষ্ট সৌজন্যের সাথে বাউল জিজ্ঞাসা করলেন।

—খোদা মালুম·········দরবেশ সাহেব আবার একটু হাসলেন, —একে অব্‌ দানা দীগর খাক্‌ এ গোর······পারসিয়ান কবি সেখ সাদীর এক লাইন কবিতা আবৃত্তি করে তিনি ব্যাখ্যা করলেন, যেখানকার দানা তোমার খোরাক আর যেখানকার মাটিতে

হবে তোমার কবর, সেই জায়গাই তোমায় টেনে নিয়ে যাবে।

বাউল হাসলেন, কথাটা ঠিক।

গাড়ি পার্বতীপুর ছেড়ে রওনা হল।

ভবানীপুর, ফুলবাড়ী এমনি সব ছোট ছোট স্টেশন পার হয়ে গাড়িখানা চলল এগিয়ে। চলতে চলতে এক সময় গাড়ির মধ্যে গুঞ্জন উঠল হিলি···হিলি।

দাড়িওয়ালা বুড়ো চেকার সাহেব পকেট ঘড়িটা বের করে সময়টা একবার দেখে নিলেন। তারপরে জনৈক প্যাসেঞ্জারের একটি টিকেট চেয়ে নিয়ে পেনসিল দিয়ে দস্তখত করতে করতে কারো দিকে না চেয়েই ব্যঙ্গ আর রসিকতার সাথে একরকম চেঁচিয়েই বললেন,—হাঁ হাঁ, হিল্লী। দিল্লী ছুট্ গিয়া, লেকিন ইসমে ক্যা ? হিল্লী তো মিলা।·······বুড়ো মিয়া সাহেবের বাড়ি বোধ হয় দিল্লীর আশেপাশেই কোথাও হবে। এবং খুব সম্ভব জীবনের সায়াহ্নে এসে অভাবনীয় ভাবে হঠাৎ জন্মভূমি থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা এখনও তিনি ভুলতে পারেননি।

হিলির কাছে ট্রেনখানা আসতেই, মনে হল যাদুমন্ত্রে মানুষগুলো যেন সম্মোহিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রায় সকলেই জানালা দিয়ে নীরবে গলা বাড়িয়ে দিয়ে মোহাবিষ্টের মত কি যেন চেয়ে দেখতে চেষ্টা করল। হসন্তযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মতই হঠাৎ উচ্চারিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বোবা হয়ে যাবার মত এই স্টেশনটা হচ্ছে এখানে হিন্দুস্তান পাকিস্তানের বর্ডার। রেল লাইনটা এখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বা। স্টেশনের উত্তরে এবং

দক্ষিণে, যথাক্রমে দুই জায়গা থেকে বের হয়ে পশ্চিমের দিকে হেলে দুলে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে অতি সাধারণ দুইটি মেঠো আল। আলের দুধারে মাঠে কৃষকেরা কাজ করছে। একই রকম চেহারা তাদের। একই সুরে তারা গান করছে আর একই রকম ভাষায় গরু বলদকে তারা বকাঝকা উৎসাহ বাহবা দিয়ে লাঙল চালাচ্ছে। কল্পনার যথেষ্ট কারুকার্য ব্যতিরেকে এই অনাড়ম্বর মেঠো আল দুটিকে দুইটি রাষ্ট্রের বিভীষিকাময় সংঘর্ষস্থল বলে মনে করতে খুব বেগ পেতে হয়। মনে হয় তবু কি যেন এক সম্মোহন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে এই নিরীহ মাটির আল ভূতে পাওয়া মূর্ছাগ্রস্ত রোগীর মত শিট্‌কে লেগে সবার কাছে অশুচি হয়ে উঠেছে। তাবিজ কবচ না নিয়ে তাই বুঝি কেউ এর কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না। এই গাড়িখানারই অন্য কোন কামরায় বসে বসে আবদুর রহমান যদি আর আর প্যাসেঞ্জারের মত এই রকম জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে থাকে, তবে সেও নিশ্চয়ই এই হাত দেড়েক উঁচু আল দুটির হাস্যকর স্পর্ধার কথাই ভাবছিল। যে স্পর্ধায় নাকি এরা আজ বাসু আর অনিলবাবুর কাছে কারা প্রাচীরের মতই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে।

—নারায়ণ.......সমস্ত কামরাখানার নীরবতা ভঙ্গ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাউল—সবই কালের ইচ্ছা···বাউল তাঁর ঝোলাঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কলকেটা বের করবার জন্য খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন।

—আল্লাহ্‌!······হাই তুললেন দরবেশ সাহেব। তারপরে

বাউলের দিকে তাকিয়ে আলাপের সূত্রপাত করলেন—পাসপোর্ট কানুন বাতিল হোবে। আদমীর কছু ফায়দা নেই, এমোন কানুন টিকবে না।

—কিন্তু, আইন কানুনের কথা,...বাউল প্রতিবাদের ছলে বললেন—ওর আবার ভালই কি আর মন্দই কি? একবার যা বসে যাবে, তা সহজে আর উঠবে না।

—কেনো? আদমী যদি ঐ কানুনের বরবাদী চায়?........ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন দরবেশ সাহেব।

—আরে, আদমী চাইলে কি হবে?......বাউল দরবেশ সাহেবের শিশু সুলভ সারল্যে কৌতুক বোধ করলেন—রাষ্ট্র ছুটো, গবরমেণ্টও দু রকমের। এ চাইবে তো ও চাইবে না। ও চাইবে তো এ চাইবে না।...বাউল তামাকের ডিবে খুললেন।

—লেকিন, ভাই বেরাদরী তো সবসে আচ্ছা........দরবেশ সাহেব বাউলের মুখের দিকে চেয়ে সমর্থন পাবার প্রত্যাশায় বল্লেন—রিয়াসৎ দুটা আছে, হুকুমৎ দুটা আছে। ঠিক আছে। লেকিন, তাজ্ হো ইয়া তার্কি হো, হিন্দুস্তান পাকিস্তান চীন রুস যো কিছু হো, সব তো একই জমীন পর আছে। ঔর আদমী তো সব ঐ হজরত আদমেরই ফরজন্দ্ আছে।

—ভাই বেরাদরী!....উদাসীনভাবে বাউল বল্লেন—কবে যে মহাকালের সে রকম ইচ্ছেটা হবে।........কল্কেটা তখন বাউল সাজিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয়ে সময়ের অপচয় আর তিনি করতে চাইলেন না।

সংসারের নিয়ম কানুন সম্পর্কে সংসার বিরাগী দুটি ব্যক্তির

এই নিস্পৃহ দার্শনিক আলাপ গাড়ির সবাই চুপ করে শুনল। হয়তো তারা অনেকেই মনে মনে নিজ নিজ ভাবে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণও করল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। গাড়িখানা ততক্ষণে হাজার ধরনের যাত্রী নিয়ে হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সীমানা রেখা ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে, কেউ তা খেয়াল করেনি।